ম্যাডাম

নিমাই ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং
কলিকাতা-৯

MADAM
A BENGALI NOVEL
BY
NIMAI BHATTACHARYYA

Rs : Five only.

এই লেখকের অন্যান্য বই—

ককটেল
রাজধানীর নেপথ্যে
ভি-আই-পি
যৌবন নিকুঞ্জে
তোমাকে
আকাশ ভরা সূর্যতারা
পার্লামেণ্ট স্ট্রীট
ক্যাম্পাস
মেমসাহেব
ডিপ্লোম্যাট
এ-ডি-সি
রিপোর্টার
ডিফেন্স কলোনী
ওয়ান আপ-টু ডাউন
উইং কমাণ্ডার
রাজধানী এক্সপ্রেস
ও
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স

সবিনয় নিবেদন,

বেশ ক'বছর আগে 'রাজধানীর নেপথ্যে' লেখা থেকে আপনাদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ, তারপর ভি-আই-পি, পার্লামেণ্ট স্ট্রীট, মেমসাহেব, ডিপ্লোম্যাট, ককটেল, তোমাকে, ডিফেন্স কলোনী, উইং কমাণ্ডার লিখে সে যোগাযোগ আরো গভীর ও দৃঢ় হয়েছে এবং এজন্য আপনাদের সবার কাছে আমি অপরিসীম ঋণী।

সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে আরেক নিমাই ভট্টাচার্যের বই বেরিয়েছে। হয়ত আরো বেরোবে, সেজন্য আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আমার বই কেনার আগে অনুগ্রহ করে আমার লেখা বইয়ের তালিকা ও মুদ্রিত স্বাক্ষর দেখে নেবেন।

সকৃতজ্ঞ

নিমাই ভট্টাচার্য

অনেক দিন আগেকার কথা। কিন্তু সব মনে পড়ছে। সব কিছু স্পষ্ট মনে আছে আমার। মনে থাকবে না? ঐ দিনটার কথা কি ভুলা যায়? অসম্ভব। কোনদিন ভুলতে পারব না। কোনদিন না, জীবনেও না।

এই এ্যালবামটায় আর কটা ছবি আছে? সব ছবি কি ক্যামেরা-ম্যানের ক্যামেরায় তোলা সম্ভব? কোন ক্যামেরাম্যান তুলতে পারে না, পারবে না। যত রকমের যত দামী ক্যামেরাই আবিষ্কার হোক, মানুষের মনের ক্যামেরার কাছে হেরে যাবেই। এইত এই এত মোটা এ্যালবামে সেই একটি দিনের কত ছবি রয়েছে। কয়েক ডজন ফটোগ্রাফার এইসব ছবি তুলেছিলেন। প্রত্যেকটা ছবি সুন্দর উঠেছে। এত বছর পরেও একটা ছবি নষ্ট হয় নি। মনে হচ্ছে কয়েক দিন আগেই তোলা হয়েছে। লরীটায় এত ভীড়। কতজন যে সেদিন ঐ লরীতে উঠেছিল তার হিসাব নেই। সবার মুখগুলোই ছোট ছোট উঠেছে। কিন্তু তবুও আমি প্রত্যেককে চিনতে পারছি। আনন্দ, বিমল, হেমেন, তুলসী, কানাই····।

ঐ তো ছোট ভাই! আনন্দে গোরার কাঁধে উঠেছে। গলায়

মালা পরেছে। সৌমেনেরই একটা মালা নিয়ে পরেছিল আর কি! সব্বাইকে দেখতে পারছি, চিনতে পারছি। ছবিগুলো সত্যিই খুব ভাল উঠেছিল কিন্তু—

কিন্তু অত বড় বড় নামকরা প্রেস ফটোগ্রাফাররাও কি আমার মনের ছবি তুলতে পেরেছেন? পেরেছেন কি অশোক, মান্নু, টিঙ্কুর আনন্দের ছবি তুলতে? দাদার গর্ব? দিদির তৃপ্তি? মা'র বুকভরা স্নেহের ছবি? প্রসেশানটা আমাদের বাড়ীর সামনে থামিয়ে সৌমেন মা-দাদাকে প্রণাম করতে এসে এক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়েছিল। শুধু এক মুহূর্তের জন্য। কোন কথা বলে নি। বলতে পারে নি। অত ভীড়ের মধ্যে আমাকে কি বলবে? কোন কথা না বললেও ঐ ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে দেখার মধ্যেই সব কথা বলা হয়েছিল। সব কথাই কি মুখ দিয়ে বলতে হয়? নাকি কান দিয়ে শুনতে হয়? ঐ এক টুকরো মুহূর্তের, ঐ অবিস্মরণীয় দৃষ্টিপাতের কি ছবি তোলা যায়? শুধু মনের ক্যামেরাতেই ও ছবি তোলা যায়।

এই পুরাণো এ্যালবামটা আমি দেখি না। দেখতে চাই না। কি হবে পিছন দিকে তাকিয়ে? কোন লাভ নেই। কোনকালেই তো ঐ দিনগুলো আর ফিরে আসবে না, আসতে পারে না। আমি জানি কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে ঠিক ঐ এ্যালবামটা হাতে নিই। ছবিগুলো দেখি। যে ছবিগুলো ঐ এ্যালবামে নেই, যেগুলো শুধু মনের এ্যালবামেই রয়েছে, সেগুলোও দেখি। দেখতে পাই। না দেখে পারি না। অতীত বড় মধুর। তাইতো মনে করব না ভেবেও মনে করি। মনে পড়ে।

এই এ্যালবামটার পরই আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে পাল্টে যায়। ব্রাউনিং-এর ভাষায় দি পাস্ট ওয়াজ এ স্লিপ, এ্যাণ্ড হার লাইফ বিগান। সত্যি আমার অতীত ঘুমিয়ে পড়েছে। একেবারে চিরনিদ্রায় মগ্ন। অতীতের

আমি আর আজকের আমি? টমাস হার্ডির দি গোস্ট্ অফ দি পাস্ট-এর একটা লাইন্ মনে পড়ছে 'উই কেপ্ট টু হাউস, দি পাস্ট এ্যাণ্ড আই'। চমৎকার! অতীত আর আমি, আজকের আমি, বর্তমানের আমি, রাজধানী দিল্লীর জনপথের এই বিরাট বাংলোর বাসিন্দা আমি, একেবারে তুটো আলাদা বাড়ী। তুটো আলাদা জগৎ।

পুরাণো দিনের কথা ভাবতে গেলেই পুরাণো দিনের অভ্যাস-গুলোও এসে পড়ে। আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী থাকলেও লিটারেচার পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগত। ইংরেজি, বাংলা তুইই। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা যে যাই পড়ুক, সাহিত্য পড়তে সবার ভাল লাগে। সাহিত্য নিয়ে তর্ক করতে করতেই সৌমেনের সঙ্গে আমার প্রথম ভাল করে আলাপ হয়। একই সঙ্গে পড়লেও খুব বেশী আলাপ ছিল না আমাদের মধ্যে। আমি, মধুমিতা সরকার, ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত ওয়াই-এম-সি-এ-তে ঢুকতেই একটা কেবিনের পর্দার ফাঁক দিয়ে শেখর চ্যাটার্জী ডাকল। আমরা গেলাম। কেবিনে ঢুকে দেখি সৌমেন বসে আছে। চা-কফি খেতে খেতে হঠাৎ লিটারেচারের কথা উঠল। সেই আলোচনা গড়াতে গড়াতে শুরু হলো 'দৃষ্টিপাত' নিয়ে তর্ক।

ইন্দ্রানী বললো, সুপার্ব! আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শেখর বললো, এত ভাবাবেগে ভেসে গেলে ি চলে? বী রিয়ালিস্টিক।

আমি বললাম, ইন্দ্রানী এই জন্যই ভাবাবেগে ভেসে গেছে যে এর আগে এমন স্বাদ বাঙ্গালী পাঠক সমাজ পায় নি। সুপার্ব কিনা বলতে পারব না তবে এটা ঠিক ভাষা নিয়ে এমন শিল্প নৈপুণ্য—আই মীন আর্টিষ্টিক পারফেক্সান—আর কোন লেখকের ভাষায় দেখা যায় নি....

সৌমেন আমাকে আর বলতে দিল না। 'কি আছে ওতে? স্কচ হুইস্কীর গঙ্গাজল খেয়েই আপনাদের নেশা হলো?'

মধুমিতা বললো, তার মানে ?

'তার মানে আবার কী? ডাল-ভাত শাঁক-চচ্চড়ি খাওয়া বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে সো কল্ড হাই সোসাইটীর ন্যাকামী তো ভাল লাগবেই। আমরা উত্তরা-পূরবী-উজ্জ্বলাতেই সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু কালে ভদ্রে মেট্রো-লাইটহাউসে গেলে আমরা কৃতার্থ বোধ করি। দৃষ্টিপাত হচ্ছে মেট্রো-লাইটহাউস। কিন্তু যে ছবিটা আমরা দেখলাম সেটা মোটেই ভাল না।'

কথাগুলো শুনতে ভালই লাগছিল কিন্তু প্রতিবাদ না করে পারলাম না। তীব্র প্রতিবাদ করলাম। আমার কথাগুলো আজ আর আমার মনে নেই কিন্তু ও কি বলেছিল তা মনে আছে। সৌমেন বলেছিল, দৃষ্টিপাত একটা সুন্দর ডকুমেণ্টারী, কোন ফিচার ফিল্ম নয়।

মধুমিতা বলেছিল, ফিচার ফিল্মও ডকুমেণ্টারী, তবে হিউম্যান ডকুমেণ্টারী।

ওর সঙ্গে আমি জুড়েছিলাম, মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার, ভাব-ভালবাসার........

সৌমেন আমাকে বাধা দিয়ে বললো, থাক থাক। আর সেণ্টিমেণ্টের কোটিং দিয়ে মর্যাদা বাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করবেন না।

সেই ছোট্ট নদীর মোহনা থেকে আজ সমুদ্রে এসে পড়েছি। এই মহাসমুদ্রে এসে যেন আমি হারিয়ে গেছি। নাকি মরে গেছি ?

জানি না। ওসব ভাবি না। ভাবতে গেলেই মাথাটা ঘুরে ওঠে। সে যাই হোক আমার সব মনে আছে। পরের দিন লাইব্রেরী থেকে বেরুবার মুখেই সৌমেনের দেখা। প্রথমে ও আমাকে দেখতে পায় নি। তাইতো আমি ওকে বললাম, কাল ঝগড়া করেছি বলে আজ কথা না বলেই চলে যাচ্ছেন ?

ও ভীষণ লজ্জিত হলো, ছি, ছি, ওকথা বলবেন না।

আমি মিট মিট করে হাসতে হাসতে বললাম, তবে যে কথা না বলেই চলে যাচ্ছিলেন ?

'আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলাম বলে ঠিক খেয়াল করি নি। খেয়াল করলে নিশ্চয়ই……'

'নিশ্চয়ই কী? আবার ঝগড়া করতেন?'

ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'ঝগড়া করতে বুঝি আপনার খুব ভাল লাগে?'

'ভাল লাগে কিনা জানি না তবে কালকে খুব আনন্দ পেয়েছি।'

'আনন্দ পেয়েছেন মানে?'

'মানে আপনার কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লেগেছে। কথা বলা যে একটা আর্ট তা আপনার কথা শুনলে বোঝা যায়।'

এই এ্যালবামটা হাতে পড়লে কলকাতার প্রত্যেকটি দিনের কথা মনে পড়ে। সেই প্রথম দিনের তর্ক থেকে দিল্লী রওনা হবার দিনটি পর্যন্ত। সবকিছু মনে পড়ে। সে সব দিনের ইতিহাসের পর কত নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। অভাবিত, কল্পনাতীত পরিবর্তন এসেছে আমার জীবনে। সেদিনের ছাত্রী আজ আমি মন্ত্রী-পত্নী। আমি ম্যাডাম। পার্সোন্যাল ষ্টাফের ম্যাডাম, অফিসারদেরও ম্যাডাম। আমার পায়ের শব্দ শুনেই বেয়ারা, চাপরাশী, অর্ডালী থেকে প্রাইভেট সেক্রেটারী পর্যন্ত উঠে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে সসম্ভ্রমে। কোনদিন গাড়ীর দরজা খুলতে হয় না, বন্ধ করতেও হয় না। আমাকে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে হয় না, আমাকে স্টেশনে গিয়ে কম্পার্টমেণ্ট খুঁজতে হয় না, আমাকে সব সময় দোকানেও যেতে হয় না—দোকানদাররাই মালপত্র নিয়ে আমার কাছে আসে। আমি যে ম্যাডাম!

আর আগে ?

মার্কেটিং করতে কি ভীষণ ভাল লাগত। জামা-কাপড় পরার চাইতে কেনার আনন্দই তো বেশী। দোকানে গিয়ে কত জিনিষ দেখা যায় ? পছন্দ-অপছন্দ করে কেনা যায়। দরাদরি করা যায়।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ছোটখাট টুকটাক কেনাকাটা করতে গিয়ে কি আনন্দই করতাম। শেখর খুব দরদস্তুর করতে পারত বলে অনেক সময়ই আমরা ওকে নিয়ে দোকানে যেতাম। সৌমেন আমাদের সঙ্গে যেতো কিন্তু দোকানের ভিতরে ঢুকত না। সব সময় দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত। কারণ জানতে আগ্রহবোধ করিনি। একদিন কফি হাউসে বসে আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ কেনা-কাটার কথা উঠল। মধুমিতা জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সৌমেন, তুমি কোনদিন আমাদের সঙ্গে দোকানে যাও না কেন বলতো ?

'কেন যাব সেটা বলো।'

'আমরা যখন সবাই যাই তখন তুমি যাও না কেন ?'

'আমরা দরাদরি করব আর তোমরা ব্যাগ থেকে টাকা বের করবে, ভাবতে গেলেও আমার পৌরুষে লাগে।'

আমি বললাম, 'তাই নাকি ?'

ও বললো, নিশ্চয়ই। দোকানের সেলসম্যানগুলো ভাবে আমরা তোমাদের মোসাহেব, তাবেদার।

শেখর বললো, 'মোটেও তা ভাবে না।'

সৌমেন বললো, 'তা কেন ভাববে ? ভাবে তুই ওদের পরমাত্মীয়।'

সব ব্যাপারেই সৌমেনের একটা নিজস্ব মতামত ছিল। সব সময় ওর মত মেনে নিতে না পারলেও আমার ভাল লাগত। ওর মত সুস্পষ্ট অভিমত আর কারুর ছিল না। তাছাড়া সেন্স অফ হিউমার ছিল চমৎকার। মালতী ঘোষাল নামে একটা মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ত। বৈঠকখানার কাছাকাছি থাকত। ও ইউনিভার্সিটির

সামনের হকার্স কর্ণারের একটা দোকান থেকে মাঝে মাঝে ব্লাউজ-ট্রাউজ কিনত। কোন কোন সময় আমি বা মধুমিতাও সঙ্গে যেতাম। একদিন আমরা তিনজনে ঐ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কেনাকাটা করছি এমন সময় সৌমেন পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। ও হাসতে হাসতে বললো, আই সাপোজ ইউ আর নট পারচেসিং এনিথিং হুইচ ইউ কাণ্ট পারচেস ইন মাই প্রেজেন্স।

আমরা তিনজনে এর-ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তারপর আমি বললাম, অমন জিনিষ আমরা কিনি না।

'সোজা কথায় বলো দাঁড়াব নাকি চলে যাব?'

'কেউ দাঁড়াতে বারণ করে নি।'

'বারণ না করলেই কি অনেক কিছু করা যায়?'

আমরা পয়সা কড়ি মিটিয়ে দিতেই প্রৌঢ় দোকানদার ভদ্রলোক ওকে বললেন, দাদাবাবু আপনাকে কিছু দেব?

'আমি তো সায়া-ব্লাউজ পরি না।

'গেঞ্জি-আণ্ডারওয়ার-জাঙ্গিয়া তো পরেন?'

'পরি কিন্তু আপনার এইসব সুন্দরী কাষ্টমারদের সামনে ওসব জিনিষ কেনা কি ঠিক হবে?

'দাদাবাবু যখন ইচ্ছে তখনই আসবেন।'

'আমি আপনার দাদাবাবু?'

'এনারা দিদি হলে আপনি তো দাদাবাবুই।'

'তাহলে আপনি কি আমার শালাবাবু?'

'তাও কইতে পারেন।'

ব্যস! তারপর থেকে ঐ ভদ্রলোকের নামই হয়ে গেল শালা-বাবু! সত্যি আস্তে আস্তে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের খুব খাতির হলো। পূরবীতে সিনেমা দেখতে গেলে ঐ দোকানে বইপত্তর রেখে যেতাম। ষ্ট্রাইক বা কোন গণ্ডগোল হলেও ওর দোকানে বই

কেন, ব্যাগ পর্যন্ত রেখেছি। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন কারণে পাঁচ-দশ টাকার দরকার হলে সৌমেন দৌড়ে গিয়ে বলতো, শালাবাবু, চটপট দশটা টাকা দেখি। শালাবাবু কোন কথা না বলে ছোট্ট কাঠের ক্যাশ বাক্স খুলে দশটা টাকা সৌমেনের হাতে দিতেন।

এসব ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা। সৌমেন তখন পার্লামেন্টের জন্য দাঁড়িয়েছে। কলকাতার কাগজে প্রার্থীদের ছবি ও পরিচয় বেরিয়েছে। সেই ছবি দেখে অনেক খোঁজ খবর করে ঐ শালাবাবু একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। বাইরের ঘরে তখন পাড়ার ছেলেদের ভীড়। নানাজনে নানা কাজ করছে। কথাবার্তা বলছে। উনি পকেট থেকে খবরের কাগজের কাটিংটা বের করে ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইটা কি ইনার বাড়ী ?

ছোট ভাই অবাক হয়ে বললো, হ্যাঁ।

'একটু খবর দেবেন। দেখা করতাম।'

'আপনার কি দরকার বলতে পারেন ?' ইলেকশনের বাজার বলে ছোট ভাই অত্যন্ত ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল। এ সময়ে কাউকেই অসন্তুষ্ট করা যায় না।

উনি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, কিছু দরকার নাই। শুধু একটু দেখা করতাম।

গোরা গিলে করা পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে ফাইলপত্তর ঠিক করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম ?

উনি হেসে বললেন, আমার নাম তো বিনোদ বিহারী সাহা কিন্তু অত লম্বা চওড়া নাম না বলে বলেন শালাবাবু আইছে। ইউনিভার্সিটির সামনের শালাবাবু।

বিনোদবাবুর কথায় ওরা তো অবাক। গোরা যখন উপরে এসে খবর দিল তখন সৌমেন স্নান করছে। আমি তাড়াতাড়ি নেমে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই বিনোদবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, একি দিদিমণি! আপনি........

উনি ভাবতে পারেন নি সেদিনের সেই ইউনিভার্সিটির দিদিমণি আর দাদাবাবু সত্যি সত্যিই........

'উনি তাহলে সত্যি সত্যিই আমার দাদাবাবু হইছেন ?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, হ্যাঁ।

বিনোদবাবুর সারা মুখে তৃপ্তির হাসি, খুব ভাল। আমি খুব আনন্দ পালাম। ইউনিভার্সিটির এত ছেলে দেখলাম কিন্তু এমন দাদাবাবু আর দ্বিতীয়টা দেখলাম না।

বিনোদবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। আমি বললাম, দাদা, বসুন।

'আপনারা তো খুব ব্যস্ত। এখন বসাটা কি ঠিক ?'

'তাহোক। আপনি বসুন।'

আমি ওকে চা-জলখাবার দিলাম। প্রথমে খেতে আপত্তি করছিলেন, পরে, আমি কয়েকবার বলার পরে খেয়েছিলেন। সৌমেন ঘরে ঢুকতেই উনি দু'হাত জোড় করে মাথা নত করে নমস্কার করলেন। আমি সৌমেনকে বললাম, চিনতে পারছ ?

'আরে শালাবাবু যে। কেমন আছেন ?' সৌমেন ওকে দেখে খুব খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'আমার মত গরীব-মুখ্যুর আর কি নতুন খবর ? আপনি তো এখন বিরাট মানুষ।'

'ইলেকশনে দাঁড়ালেই কি বিরাট মানুষ হওয়া যায় ?'

আমি সৌমেনকে বললাম, জান, খবরের কাগজে তোমার ছবি দেখে উনি কত ঘুরে ঘুরে আমাদের এই ঠিকানা জোগাড় করেছেন।

সৌমেন কৃতজ্ঞতার সুরে বললো, তাই নাকি ?

'হ্যাঁ।'

সৌমেন বিনোদবাবুকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললো, আরে এ হচ্ছে আমার আসল ও প্রথম শালাবাবু।

ঐ সামান্য হকার বিনোদবাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইলেকশনের

কাজে। একা নয়, কলেজ স্কোয়ারের আরো অনেক হকারকে নিয়ে। উনি যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন তা ভাবা যায় না। শুধু তাই নয়, বিনোদবাবু ও তাঁর দলের কেউ ইলেকশন অফিসের পয়সায় চা-সিঙ্গাড়াও খেতেন না। ছোট ভাই একদিন আমাকে বললো, বৌদি, ওরা এত পরিশ্রম করছেন অথচ এককাপ চা-সিঙ্গাড়াও খান না।

'কেন?'

'বলেন, দাদাবাবু কি ব্ল্যাক মার্কেটের পয়সায় ইলেকশন লড়ছেন যে ওর পয়সা ওড়াব?'

গোরা বললো, জানেন বৌদি, একটা সিগারেট অফার করলেও উনি নেন না। বলেন ওর কাছে বিড়ি আছে।

সৌমেন ইলেকশন জিতলে বিনোদবাবু আনন্দে উন্মাদ হয়ে এত হৈ হৈ, এত চীৎকার করেছিলেন যে পরের দিনই জ্বরে পড়লেন। সেদিন সবাই নানা কারণে ব্যস্ত। সৌমেনের তো মরবার পর্যন্ত সময় ছিল না কিন্তু তবুও ও আমাকে নিয়ে বিনোদবাবুকে দেখতে গিয়েছিল। তারপর গোরা আর ছোট ভাইকে দিয়ে কানাই ডাক্তারকে পাঠিয়েছিল।

আজ এই জনপথের মন্ত্রী নিবাসে বসেও আমার সব স্পষ্ট মনে পড়ছে। এই এ্যালবামে বিনোদবাবুর ছবি দেখেই সব কথা মনে পড়ল। মনে পড়ছে আরো অনেক কথা। সৌমেন মন্ত্রী হবার পর যখন প্রথম কলকাতা যায়, তখন বহু লোক দমদম এয়ার পোর্টে ওকে অভ্যর্থনা জানায়। আমি ভাবতে পারি নি দমদমে অত লোক

আসবে। সৌমেনকে জীপ গাড়ীতে চড়িয়ে বিরাট শোভাযাত্রা ঠিক রওনা হবার মুখে আমার গাড়ীর কাছে এসে বিনোদবাবু বললেন, দিদিমণি, দাদাবাবু মন্ত্রী হওয়ায় আমরা খুব খুশী। .আমি ওকে প্রায় জোর করে আমার গাড়ীতে তুলে নিলাম। কত কথা বললেন! কি দারুণ খুশী! ভাবলেও অবাক লাগে।

মজা হয়েছিল পরের দিন। সৌমেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও অফিস দেখতে যাবার পথে হঠাৎ ইউনিভার্সিটির সামনে গাড়ী থামাল। অফিসারের দল তো অবাক। ওরা ভাবলেন হয়ত কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। হয়ত নতুন মন্ত্রী কোন কারণে রেগে গিয়েছেন। ভয়ে অফিসারদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। আমি ঠিক জানতাম ও বিনোদবাবুর দোকানে যাবে। ঠিক তাই। বিনোদবাবু সৌমেনকে দেখেই পাগলের মত চীৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীড় জমে গেল ওকে ঘিরে। তারপর বিনোদবাবুকে পাশে পাশে নিয়ে ও সমস্ত হকার্স কর্ণার ঘুরল। শুনল ওদের দুঃখের কথা, দাদাবাবু, পুলিশ আর গুণ্ডাদের অত্যাচারে আমরা পাগল।

ও থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, তার মানে?

'দাদাবাবু, গুণ্ডাদের টাকা না দিলেই উরা দোকান থেকে জামা-কাপড় নিয়ে চলে যায়। আমরা নিজেদের বৌ-ছেলেমেয়েদের একটা কাপড়-জামা দিতে পারি নে আর·······

'তাই নাকি?'

'তবে কি বলছিলাম দাদাবাবু। রাগ করে উরা তো কয়েকবার আগুন লাগায় দিয়েছে। ঐ আগুনে আমাদের কত সর্বনাশ·······

'বলেন কি?'

'হ্যাঁ দাদাবাবু। ভগবানের কাছেও হয়ত মিথ্যে কথা বলতি হবে কিন্তু আপনাকে কোন মিথ্যে বলতি পারব না।'

'আপনি মিথ্যে কথা বলবেন কেন?'

ততক্ষণে সারা ইউনিভার্সিটি আর কলেজ ষ্ট্রীট খবর ছড়িয়ে গেছে নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৌমেন রায় এসেছেন। হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে হকার্স কর্ণারের চারপাশে। কয়েকটা পুলিশের গাড়ীও এসে গেছে। পুলিশকে দেখে তখন আর বিনোদবাবু ভয় পান না।

'জানেন দাদাবাবু, প্রত্যেকটা দোকান থেকে পুলিশকে রোজ পাঁচ টাকা অর্থাৎ মাসে মাসে দেড়শ' টাকা দিতে হয়.......

সৌমেন চমকে ওঠে, প্রত্যেক দোকান থেকে দেড়শ' টাকা ?

'হ্যাঁ দাদাবাবু।'

কয়েকজন চীৎকার করে বললো, টাকা না দিলেই থানায় নিয়ে যায় আর থানায় নিয়ে আমাদের নতুন কাপড় চোপড় চুরি করে।

'সত্যি ?'

বিনোদবাবু বললেন, সব সত্যি।

খবর চলে গেছে খবরের কাগজের অফিসে। হাজার হোক ইনফরমেশন ব্রডকাষ্টিং-এর মন্ত্রী। রেডিও-সিনেমা-খবরের কাগজের মন্ত্রী! প্রেস ফটোগ্রাফারদের ফ্লাশ বালব্ জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। সব কিছু দেখে আমার কি দারুণ উত্তেজনা। হকার্স কর্ণার থেকে রাস্তায় এসে দেখি সারা রাস্তা জুড়ে লোকের ভীড়। ট্রাম চলছে না। পুলিশ বাস ঘুরিয়ে দিচ্ছে। ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়ে আর হকার্সদের অনুরোধে সৌমেন পুলিশ জীপের উপর উঠে দাঁড়িয়ে একটা ছোট বক্তৃতাও দেয়।

সে বক্তৃতার কথাগুলোও আমার মনে আছে। ও বলেছিল, আমিও আপনাদের মত একজন সাধারণ মানুষ। আমি জানি কী তীব্র সংগ্রাম করে আপনাদের বাঁচতে হয়। তাছাড়া আপনাদের উপর যে অত্যাচার হয় সে কথা শুনে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীন দেশের সৎ নাগরিকদের উপর এই অত্যাচার হওয়া শুধু লজ্জার নয়, কলঙ্কের।

শেষে ও বলেছিল, আমি এখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যাচ্ছি। সেখান থেকেই আমি চীফ্ সেক্রেটারীকে ফোন করে বলব আজ থেকেই এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে নইলে আমি নিজে চীফ্ মিনিষ্টারকে দিয়ে এই অত্যাচার বন্ধ করাব।

আনন্দে, উল্লাসে হকার্সরা ফেটে পড়েছিল। ওদিকে ইউ-নিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা চীৎকার করছিল, সৌমেনদা! উর্মিলাদি! ইউনিভার্সিটিতে আসুন।

সৌমেন আবার পুলিশ জীপের উপর উঠে দু'হাত জোড় করে বললো, আজকে আপনারা মাপ করুন। আজ আমার অনেক কাজ। আগামীকাল বিকেলের দিকে আমি আপনাদের কাছে আসব।

সব কিছু আমার মনে আছে। মনে আছে রেডিও অফিস থেকে ও চীফ্ সেক্রেটারীকে ফোন করেছিল। চীফ্ সেক্রেটারী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সব ব্যবস্থা করবেন। সত্যি উনি ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পুলিশ কমিশনার নিজে ডেপুটি কমিশনার-এ্যাসিট্যান্ট কমিশনারকে নিয়ে কলেজ স্কোয়ার হকার্স কর্ণারে গিয়ে সব কিছু শুনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। রাত্রে বিনোদবাবু আমাদের রাজবল্লভ পাড়ার বাড়ীতে এসে সৌমেনকে বলেছিলেন, দাদাবাবু, আপনার এক টেলিফোনে সব ঠাণ্ডা।

ঠিক এই সময় ডেপুটি কমিশনারের জীপ এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ীর সামনে। ডেপুটি কমিশনার বাইরের ঘরে ঢুকেই সৌমেনকে স্যালুট করলেন। তারপরই বিনোদবাবুকে নমস্কার করে বললেন, ভাল আছেন তো?

বিনোদবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, দাদাবাবু যখন সেণ্ট্রাল মন্ত্রী হয়েছেন, তখন তো ভাল থাকবই।

ডেপুটি কমিশনার সৌমেনকে বললেন, স্যার, সি-পি নিজে এসে সব কিছু দেখে শুনে ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। ঐ এরিয়ার ও-সি'কে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তাছাড়া পুলিশ পেট্রল...

সৌমেন বললো, যাই হোক দেখবেন এই গরীব লোকগুলোর একটা পয়সা যেন গুণ্ডা বা করাপটেড পুলিশ অফিসারের পকেটে না যায়।

'না স্যার, সে আর সম্ভব হবে না।'

'আপনি নিজে একটু বিনোদবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

কত নতুন স্মৃতি জমেছে আমার মনে। কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে কিন্তু বিনোদবাবুকে ভুলতে পারি নি। কলকাতায় গিয়ে কলেজ স্ট্রীটের ঐ দিকে গেলেই কলেজ স্কোয়ার হকার্স কর্ণারে না গিয়ে পারি নি। কত খুশী হতো ওরা। দিদিমণি দিদিমণি করে গর্বে আনন্দে ওরা সবাই যেন পাগল হয়ে উঠত।

দাদা খুব খুশী হয়েছিলেন। সৌমেনকে ডেকে বলেছিলেন, মন্ত্রী হয়ে তুই কতদূর কি করতে পারবি তা জানি না, তবে যেদিকেই তাকাবি সেখানেই এই রকম অন্যায়-অবিচার দেখতে পাবি। এইগুলো যদি দূর করতে পারিস তাহলেই যথেষ্ট।

এই দাদা একটা লোক বটে! স্নেহ-ভালবাসার হিমালয়! হিমালয়ের স্নেহধারায় লক্ষ-কোটি মানুষ ধন্য। যুগ যুগ ধরে এই স্নেহধারা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষের কোণায়-কোণায়। তবু তার শেষ নেই। সে অশেষ। দাদাও যেন একটা ছোট্ট হিমালয়। সত্যি এমন মানুষ আমি দেখি নি। আজ পর্যন্ত দেখি নি। হয়ত আর দেখবও না।

সৌমেনের বাবা যখন মারা যান তখন দাদা সবে কলেজে ভর্তি হয়েছেন। দুটো ছোট ভাই-বোন আর বিধবা মা। পোষ্ট অফিসের পাশ বইতে মাত্র সাড়ে ছ'শ টাকা ছিল। সে টাকা দিয়ে শ্রাদ্ধের দায় মিটল, কিন্তু সংসার? সংসার চলবে কিভাবে? মা ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। দাদা বলেছিলেন, মা, তুমি শুধু প্রাণভরে আশীর্বাদ কর। আর কিচ্ছু চাই না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই রাজবল্লভ পাড়ায় তিন-চারটে টিউশানি শুরু করলেন দাদা। আস্তে আস্তে প্রাইভেট টিউটার হিসেবে দাদার খ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়ল যে বাড়ীতে কোচিং ক্লাশ খুলতে বাধ্য হলেন। এইভাবে সংসার চালিয়ে লেখাপড়া করেছেন। ভাইবোনকে পড়িয়েছেন। কি করেননি দাদা? নিজে চাটার্ড এ্যাকাউন্টটেন্ট হয়েছেন, বোনকে বি. এ. পাশ করিয়ে বিয়ে দিয়েছেন, সৌমেনকে এম. এ. পাশ করাবার পর ডক্টরেট করতে বলেন। সৌমেন রাজী হয় না। বলেছিল, না দাদা, আর না। এবার চাকরি করব।

দাদা বলেছিলেন, কেন? আমার রোজগারে কি সংসার চলছে না?

সৌমেন হাসতে হাসতে বলেছিল, সংসার নিশ্চয়ই চলছে তবে তুমি একাই সব পুণ্য অর্জন করবে, সেটা কি ঠিক?

দাদাকে প্রথম দিন দেখেই আমার খুব ভাল লেগেছিল। অবশ্য সৌমেনের কাছে ওর দাদার সম্পর্কে এত কথা শুনতাম যে না দেখলেও দাদাকে আমি মনে মনে ভক্তি করতাম। ভালবাসতাম। দিদি আমাকে দাদার ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই যে তোমার এক নতুন শিষ্যা। ঠাকুরপোর সঙ্গে পড়ে।

দাদা আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই লজ্জিত হয়ে দিদিকে বললেন, কি যা তা বলছ?

দিদি মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললেন, যা তা কেন বলব? ঊর্মি তোমার দারুণ ভক্ত।

দাদা দিদির সঙ্গে তর্ক না করে একটা মোড়া টেনে আমাকে বসতে দিয়ে বললেন, বসো।

বসার আগে আমি দাদাকে প্রণাম করলাম। এই প্রণাম করার জন্য দিদি আর সৌমেন কি হাসাহাসিই করেছিল। ও বলেছিল, দেখলে বৌদি, কি ওস্তাদ মেয়ে! কিভাবে কিস্তি মাৎ করল, দেখলে?

দিদি বলেছিলেন, সবই দেখি, সবই বুঝি।

'তার মানে?'

'তার মানে আবার কী? তুমি যেভাবে ডাইরেকশান দিয়েছ তাতে কিস্তি মাৎ না হয়ে উপায় আছে?'

সৌমেন হাসতে হাসতে বললো, আমি ওকে শিখিয়ে দিয়েছি, তাই না? দাদাকে প্রণাম করার কথা যাকে শিখিয়ে দিতে হয় সে রকম মেয়ের সঙ্গে আমি ভাব করি না।

দিদি কফি করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাই ঊর্মি, আমার হাত বন্ধ। তুমি একটু আমার হয়ে হাততালি দেবে?

আমি বসার পর দাদা আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নামটা তো জানি না বোন।

'দাদা, আমার নাম ঊর্মিলা সরকার।'

'বাঃ। ভারী সুন্দর নাম তো!'

আমি হাসলাম।

'হাসছ কেন বোন? তোমার নামটা ভাল বললাম বলে?'

'আজকাল তো এসব নাম বিশেষ কেউ পছন্দ করেন না...

'এসব নাম সেকেলে ঠিকই তবে এসব নাম শুনলেই চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে, একটা ইতিহাস ভেসে ওঠে, তাই আমার ভাল লাগে।'

আমি চুপ করে বসেছিলাম। দাদাই আবার কথা বললেন, তুমি আজই প্রথম আমাদের বাড়ী এলে?

'না দাদা, এর আগেও এসেছি।'

'শেখর, মধুমিতা আর একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। খুব ভাল লেগেছিল।'

আমি হেসে বললাম, দাদা, আপনি নিজে ভাল বলে সবাইকেই ভাল মনে করেন।

দাদা হেসে জবাব দিলেন, তোমার এই কথাতেই বুঝতে পারছি

বোন, তুমি আমার চাইতেও কত ভাল।

দাদার কথাবার্তাই এই রকম। ভারী সুন্দর, ভারী মিষ্টি। সব কথাতেই কেমন একটা প্রচ্ছন্ন স্নেহভাব। একটা দিনের কথা আমার খুব মনে পড়ে। বিকেলবেলায় ইউনিভার্সিটি থেকে আমিও সৌমেনের সঙ্গে ওদের বাড়ী এসেছি। সামনের ঘরে সৌমেনের মা, বৌদি ও আমরা দুজনে বসে বসে গল্প করছিলাম। এমন সময় দাদা ঘরে ঢুকে আমাদের সবাইকে দেখে নিয়েই মাকে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ মা, মিনুর কোন চিঠি এসেছে?

মা বললেন, আজ দুপুরের ডাকেই চিঠি এসেছে। এক্স্‌রে করে দেখেছে পেটে ষ্টোন নেই। তাছাড়া এই কদিন ওষুধ খেয়ে ব্যথাটাও গেছে।

দাদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, দেখেছ মা, ঊর্মিলা বাড়ীতে এলেই একটা ভাল খবর পাওয়া যায়।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আমার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি মাথা নীচু করে বসে রইলাম। লজ্জায় দাদাকে প্রণাম করতেও পারলাম না।

মা বললেন, তুই ঠিক বলেছিস বড়।

দিদি ঠাট্টা করে বললেন, হ্যাঁ ঊর্মি, তুমি কি কিছু তুক-তাক করেছ যে তোমার দাদা তোমার এত ভক্ত হয়ে উঠেছেন?

আমি অনেক দিন পরে শুনেছিলাম দাদা আমাকে প্রথম দিন দেখেই দিদিকে আর মাকে বলেছিলেন, এই মেয়েটাকে ঘরে আনা যায় না?

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হঠাৎ তুই একথা বলছিস?

দাদা বলেছিলেন, মেয়েটা শুধু ভাল নয়, অস্বাভাবিক ভাল। মেয়েটাকে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

সৌমেনকে আমার সত্যি ভাল লাগত। ভালবাসতাম কিন্তু ভালবাসলেই কি বিয়ে হয়? নাকি বিয়ে করা যায়? অমন একটা দাদা, অমন একটা পরিবার দেখে সত্যি আমার লোভ লেগেছিল। হাজার হোক ঐ বয়সে সব মেয়েই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। আমিও দেখেছি। আমিও ভেবেছি ভবিষ্যতের কথা। স্বামীর কথা, শ্বশুরবাড়ীর কথা। ভাবতে ভাল লাগত, ভাবতে ইচ্ছা করত। না ভেবে পারতাম না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে অনেক দিনের চেষ্টার পর বাবা দিদির বিয়ে দেন। দিদি আমার মত এম.এ না পড়লেও বি.এ পাশ করেছিল। ভাল গান গাইতে পারত। তাছাড়া দিদি ঠিক মার মত রান্না করতে পারত। প্রচুর খরচ করেই বাবা দিদির বিয়ে দেন কিন্তু দিদি সুখী হয় নি। কাউকে বলতে না পারলেও আমি জানি জামাইবাবুর চরিত্র ভাল নয়। মা-বাবার কাছে দিদি সব কিছু খুলে না বললেও তাঁরা সব কিছুই বুঝতে পারেন। দিদির মুখের দিকে তাকালেই সব কিছু বুঝা যায়। অথচ দিদির সংসার দেখে কিছু বুঝার উপায় নেই। কথাবার্তা, আলাপে-ব্যবহারে দিদির প্রতি কর্তব্য পালনে জামাইবাবুর কোন ত্রুটি নেই। আমি বি. এ পরীক্ষা দেবার পর প্রায় মাস খানেক দিদির ওখানে ছিলাম। সকালবেলায় ডিলুক্সে রওনা হয়ে রাত্রেই এলাহাবাদ পৌঁছেছিলাম। দিদিকে নিয়েই জামাইবাবু স্টেশনে এসেছিলেন। দিদির জর্জ টাউনের বাড়ীতে পৌঁছে আমি অবাক হয়েছিলাম। কলকাতার শহরেও এত সাজান-গোছান সংসার দুর্লভ। সংসারকে সুন্দর করতে যা কিছু প্রয়োজন, সবকিছু জামাইবাবু করেছেন! কিন্তু সব মেয়েই যা চায়, সেই স্বামীর ভালবাসাই দিদি পায় না। পেল না।

দিদির কথা ভাবতে গেলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। সারা মনটা তেতো হয়ে যায়। দিদির এইরকম হবার পর বাবা-মা কোনদিন আমার বিয়ের কথা বলতেন না। আগে আগে বাবা

বলতেন গ্রাজুয়েট হবার পরই মেয়েদের বিয়ে দেবেন। কিন্তু বি. এ পাশ করার পর বাবাই আমাকে বললেন এম. এ পড়তে। শুধু বাবা-মা নয়, আমি নিজেও অনেকদিন পর্যন্ত নিজের বিয়ের কথা ভাবি নি। ভাবতে পারি নি। অথচ একদিন আবার নিজের কথা, নিজের বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করলাম। একটা সুন্দর মনের মত স্বামী আর শ্বশুরবাড়ীর স্বপ্ন আমাকে মাতাল করে তুলল।

সেসব দিনের কথা ভাবলে সত্যি হাসি পায়। লজ্জা লাগে। কাউকে এসব কথা বলা যায় না। বিয়ের অনেক দিন পর সৌমেনকে বলেছিলাম কিন্তু আর কাউকে বলি নি। ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হবার পর প্রথম প্রথম খুব কমই ওদের বাড়ী যেতাম। গেলেও একলা যেতাম না। অন্ততঃ আর একজন কাউকে নিয়ে যেতাম। গেলেও বেশীক্ষণ থাকতাম না। বড় জোর এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা। তার বেশী কখনই না। সিক্সথ্ ইয়ারে ওঠার পর যাতায়াতটা খুব বেশী বেড়ে গেল। ক্লাশ শেষ হলেই ওর সঙ্গে ঠিক শ্যামবাজার বা বাগবাজারের বাসে উঠতাম। ওদের বাড়ীতে কিছুক্ষণ গল্পগুজব আড্ডা না দিয়ে পারতাম না। ওদের বাড়ী যাওয়াটা নেশায় দাঁড়িয়েছিল। কিছুকাল ঐ রকম নিয়মিত আড্ডা দেবার পর অনুভব করলাম বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করত ওদের ওখানেই থেকে যাই। অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে, খাওয়া-দাওয়া করে, ওখানেই শুয়ে থাকি। সৌমেনের বিছানায় শুয়ে পড়ি। সারা রাত শুয়ে থাকি। ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে থাকি।

আরো অনেক কিছু ইচ্ছা করত। ইচ্ছা করত দাদার কাছে বসে থাকি, দিদির সঙ্গে আড্ডা দিই, অশোক-মানুকে নিয়ে বেড়াতে যাই, মার কাছে সৌমেনের ছোটবেলার গল্প শুনি। খুব ইচ্ছা করত। বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা করত না। ফেরার সময় মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যেত।

হরিদ্বার বা বেনারসের গঙ্গার ধারে বসে বুড়ীরা যেমন জপের

মালা নিয়ে একই মন্ত্র বছরের পর বছর জপ করেন, আমিও সেইরকম এই জনপথের এই বাংলোর বারান্দায় বসে বসে শুধু অতীত স্মৃতি রোমন্থন করি। না করে পারি না। এত বড় পৃথিবীতে যত সম্পদই ছড়িয়ে থাকুক, শুধু স্মৃতি ছাড়া মানুষের একান্ত নিজস্ব কোন সম্পদ নেই। মানুষ সব কিছু হারাতে পারে, সব কিছু চলে যায়, হারায় না চলে যায় না শুধু স্মৃতি। অতীত দিনের স্মৃতিটুকু হারাবার পর আর কি থাকে মানুষের?

কিচ্ছু না। মহাশূন্য। চির অন্ধকার। যে মনের মনিকোঠায় স্মৃতিটুকু ধরে রাখতে পারে না, সে উন্মাদ। সে পাগল। সে মাটির পৃথিবীতে বিচরণ করলেও মহাশূন্যে ভাসছে। সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

দুই

চুপ চাপ বসে যে নিজের কথা ভাবব, সব সময় তারও উপায় নেই। কেউ না কেউ বিরক্ত করবেই। হয়ত একের পর এক। নানা জনে নানা অছিলায়। কোন কাজে নয়। আমার স্বামী মন্ত্রী কিন্তু আমি কে? আমার কি ক্ষমতা? কিছুই না। তবু এরা আসেন। দিল্লীতে এদের আসা কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না।

ভিতরের এই বারান্দায় বসতে আমার খুব ভাল লাগে। সামনের চাইতে ভিতরের লন অনেক বড়, অনেক সুন্দর। সামনের দিকেও সুন্দর লন, সুন্দর ফুলের বাগান আছে কিন্তু ভিতরের তুলনায় কিছু না। সামনের দিকের সব কিছু সাধারণের জন্য, ভিতরের সব কিছু মন্ত্রীর সুখের জন্য। চিত্ত বিনোদনের জন্য। সামনের দিকের ড্রইং-রুমে সোফা-কার্পেট আছে ঠিকই কিন্তু ভিতরের দিকের আমাদের নিজস্ব ড্রইংরুমটা অতুলনীয়। বছর দুই আগে সব কিছু পালটান হয়। মেক্সিকান এ্যাম্বাসেডরের সঙ্গে সৌমেনের খুব ভাব। দু'বছর আগে মেক্সিকো থেকে একজন বিখ্যাত ইন্টিরিয়র ডেকরেটার দিল্লী এ্যাম্বাসেডরের অনুরোধে উনি আমাদের ড্রইংরুমের একটা ডিজাইন করে দেন। সত্যি অপূর্ব হয়েছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

কার্পেটের তলায় ফোমড্ রবারের সীট। পা পড়লেই নেমে যায়, ডুবে যায় কার্পেটের মধ্যে। রাজস্থান চীফ্ মিনিষ্টারের দেওয়া জয়পুরী কাজ করা দুটো বিরাট বিরাট লাইট ষ্ট্যাণ্ড জ্বাললে ঘরটাকে স্বপ্নপুরী মনে হয়। শুধু ভি-আই-পি আর ব্যক্তিগত বন্ধুদের জন্য এই ড্রইংরুম। সাধারণ অতিথিদের প্রবেশ নিষেধ।

ভিতরের লনটাও আমাদের এক্সক্লুসিভ। পাঁচ-ছ'জন মালী সারাদিন কাজ করে। দুপুর বেলায়, লাঞ্চের সময়, শুধু সামনের দিকের একটা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে, মোটা মোটা শুকনো বজরার রুটি খায়। কলকাতায় থাকতে কাউকে বজরার রুটি খেতে দেখি নি। গরীব রিক্সাওয়ালাদের ছাতু খেতে দেখেছি। কাঁচা লঙ্কা আর একটু তেঁতুল দিয়ে শুকনো শুকনো দলা দলা ছাতু খেতে দেখেছি। তখন ওদের ঐ ছাতু খাওয়া দেখেই অবাক হতাম। প্রথম প্রথম দিল্লী আসার পর বজরার শুকনো রুটি খাওয়া দেখে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবতাম এই রুটি মানুষে খায়? খেতে পারে? কলকাতার গরু-মোষেও বোধহয় এই রুটি খাবে না। এই রুটির তুলনায় শুকনো ছাতু তো স্বর্গ! এখন জানি, প্রতিদিন দেখছি, এই শুকনো বজরার রুটি খেয়েই ওরা গোলাপের চাষ করে, প্রাসাদ গড়ে। সৌন্দর্যের সাধনা করতে গিয়ে দিল্লীর মানুষগুলো, রথী-মহারথীরা অমানুষ হয়ে গেছে। পাথর দিয়ে তৈরী প্রাসাদে থাকতে থাকতে এরা মন হারিয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে। তা নয়ত ওদের দিয়ে গোলাপের চাষ করিয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে?

অনেক আগে আমি ওদের রুটি খেতে দিতাম। আটার রুটি। তরকারী দিতাম। এখন দিই না। আস্তে আস্তে বন্ধ করেছি। হয়ত ইচ্ছায়, অথবা অনিচ্ছায়। জানি না। এখন ওদের বজরার রুটি খাওয়া দেখে অবাক হই না। ধরে নিয়েছি ওটাই স্বাভাবিক। আগে গোলাপের দিকে তাকালেই ঐ শুকনো পোড়া পোড়া বজরার

রুটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। কাশ্মিরী গোলাপের গন্ধও সহ্য করতে পারতাম না। এখন পারি। এখন আমার গোলাপের গন্ধ ভাল লাগে।

ভিতরের বারান্দায় বসে বসে দূরের গোলাপের গন্ধ উপভোগ করছিলাম আর কত কি ভাবছিলাম। ঐ এ্যালবামের ছবিগুলো দেখতে দেখতে পুরাণো দিনের কথা ভাবছিলাম কিন্তু পর পর দুজন লোক আসায় এ্যালবামটা পাশে সরিয়ে রেখেছিলাম। ওরা চলে যাবার পর পরই আবার এ্যালাবামটা টেনে নিয়েছি। পুরাণো দিনের ছবি দেখছি।

সৌমেন সিঙ্গাপুর গিয়েছে। ইকাফে কনফারেন্সে ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের লীডার। মঙ্গলবার দিল্লী থেকে মাদ্রাজ যায়। সেখান থেকে সিঙ্গাপুর পৌঁছেছে পরশু দিন। আজ থেকে কনফা-রেন্স শুরু। এক সপ্তাহ সিঙ্গাপুরে কাটিয়ে দু'দিনের জন্য মালেশিয়া সরকারের আমন্ত্রণে কুয়ালালামপুর যাবে। সেখান থেকে ম্যানিলা। চারদিন ম্যানিলায় কাটিয়ে দু'দিনের জন্য ব্যাংকক। ব্যাংকক থেকে কলকাতা। ভীমাপ্পার মেয়ের বিয়ের জন্য আমি একলাই আছি। ঐ বিয়েতে আমাকে থাকতেই হবে। তারপর সোমবার আমিও কলকাতা যাব। বাঁচব। প্রাণ খুলে হাসব, গল্প করব। তারপর ওর সঙ্গেই দিল্লী ফিরব। ও নেই বলে বাড়ীতে কোন উত্তেজনা হৈ-চৈ নেই। তাছাড়া ও থাকলে এই এ্যালবাম দেখতে পারি না। ও পছন্দ করে না। ঠাট্টা করে।

এই যে ওর এই ছবিটাই আমার সব চাইতে ভাল লাগত। ইলেকশনের সময় এই ছবিটা দিয়েই ওর পাবলিসিটি করা হয়। তার অবশ্য কারণ ছিল। এই ছবিটার যে একটা ইতিহাস আছে। সিক্সথ্ ইয়ারের শেষ ক্লাশ হবার পর আমরা দল বেঁধে লাইটহাউসে সিনেমা দেখলাম। তারপর এক একজন করে সবাই চলে গেল। আমরা দুজনে অত সহজে চলে যেতে পারলাম না। দুজনেই কথা না বলে

হাঁটছিলাম। অনেকক্ষণ পর ও বললো, কাল থেকে ইউনিভার্সিটি যেতে হবে না ভাবতেই কেমন লাগছে, তাই না?

আমি বললাম, তুমি বুঝতে পারছ না কেমন লাগছে?

'যে উর্মির উর্মিমালা দেখে দু'বছর কাটিয়েছি সেই উর্মিকে যদি কাল থেকে দেখতে না পাই তাহলে...

শুনতে ভাল লাগলেও প্রতিবাদ করলাম, ইদানীং কালে তুমি যে উর্মির চাইতে উর্মিমালাকেই বেশী চাও, তা আমি জানি।

সেই সেদিন সন্ধ্যায় পার্ক ষ্ট্রীটের একটা স্টুডিওতে আমরা দুটো আলাদা আলাদা ছবি তুললাম। আমার ছবি ও রাখল, ওর ছবি আমার কাছে রইল। সত্যি ভারী স্মন্দর ছবিটা উঠেছিল। সৌমেন-কে দেখতে তো চমৎকার। তখন যেন আরো স্মন্দর ছিল। চোখ দুটোর দিকে তাকান যেত না। ছবিতেও না। আমি ওকে ওর ছবিটা দেখিয়ে বলেছিলাম, বাপরে বাপ! কি অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছ?

ও বলেছিল, তোমার উর্মিমালার দিকে তাকিয়েই তো ছবি তুলে-ছিলাম। অদ্ভুত না হয়ে উপায় আছে?

ঐ ছবিটায় ওর চোখ দুটো দেখলেই মনে হতো ও যেন নেশা করে স্বপ্ন দেখছে। আর একদিন শুধু ওকে অমন করে তাকাতে দেখেছি। বিয়ের দিন নয়, ফুলশয্যার রাত্রে। আমার সমস্ত শরীরে শিহরণের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। আমি অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলাম। তারপর আমি ওকে একটা প্রণাম করে, দু'চোখ ভরে ওকে দেখেছিলাম। প্রাণ ভরে দেখেছিলাম। ও দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা তুলে ধরে বলেছিল, উর্মি, অমন করে আমাকে দেখো না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

'আমি সহ্য করতে পারি না।'

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আজকেও তোমাকে একটু ভাল করে দেখব না?

কয়েকদিন পরে সৌমেন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, চরিত্রহীনের কিরণময়ীর কথা মনে আছে ?

'আছে। কিরণময়ীকে কেউ ভুলতে পারে ?'

'মনে আছে উপেন যেদিন কিরণময়ীকে দেখে ?'

এতক্ষণে আমি বুঝলাম। একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললাম, সন্ধ্যাবেলায় সামান্য প্রদীপের আলোয় কিরণময়ীকে দেখে আদর্শবান চরিত্রবান উপেনের মনেও ঝড় উঠেছিল। সেই কথা বলছ তো ?

ও অবাক হয়ে বললো, তোমার তো, সবকিছু মনে আছে !

'ওসব কি কেউ ভুলতে পারে ?'

'তোমার সত্যি লিটারেচার পড়া উচিত ছিল।'

'তোমার জন্যই তো লিটারেচার পড়া হলো না।'

'আমার জন্যে ?'

'তবে কি ? লিটারেচার পড়লে তুমি উর্মিমালার শোভা দেখতে কেমন করে ?' হাসতে হাসতেই বললাম।

আরো কি কি যেন বলেছিলাম। শুনেছিলাম। সেসব কি এতদিন এত বছর পর মনে থাকে ? তবে মনে আছে কিছুক্ষণ পরে ও আমাকে বলেছিল, জান উর্মি, সে রাত্রে তুমি ঠিক কিরণময়ীর মত আমাকে এক ঝলক দেখেই পাগল করেছিলে।

তারপর উপেনের মত সৌমেন আমার প্রতি কর্ত্তব্য করেছে কিন্তু আমাকে নিয়ে পাগল হতে ভুলে গিয়েছিল। অনেকদিন, অনেক বছর। এইত কয়েক বছর আগে একদিন হঠাৎ ব্যতিক্রম হলো। দিল্লীতে সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী অনারেবল শ্রীসৌমেন রায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। আমিও গিয়েছিলাম। উদ্বোধন অনুষ্ঠান চলার সময় মঞ্চে যাই নি কিন্তু ছবি দেখার সময় মন্ত্রীর পাশে বসার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেদিন পাশাপাশি বসে

'দেবী' দেখতে দেখতে ও ফিস ফিস করে আমার কানে কানে বলেছিল, উর্মি, ঐ চোখ দুটো দেখে ফুলশয্যার রাত্রের কথা মনে পড়ছে।

আমিও খুব আস্তে আস্তে বললাম, তাই নাকি ?

'হ্যাঁ। সে রাত্রে তুমিও ঠিক এমন ভাবেই আমাকে দেখে আমাকে পাগল করেছিলে।'

শুনতে ভাল লাগলেও একটু না হেসে পারলাম না। বললাম, সে সব দিনের কথা তোমার মনে পড়ে ?

'সব না মনে পড়লেও কিছু কিছু তো মনে পড়ে।'

ঠিক। কিছু কিছু। ঐ কিছু কিছুর মেয়াদই বা কতকাল ?

এই পুরানো এ্যালবামটা হাতে নিলেই আমি যেন কেমন হয়ে যাই। আমি যেন আর আমি থাকি না। আমি ভুলে যাই বর্তমান। ভুলে যাই কঠিন রূঢ় বাস্তব। ভুলে যাই আমি সেণ্ট্রাল মিনিষ্টার সৌমেন রায়ের স্ত্রী। ভুলে যাই আমি উর্মি না, আমি ম্যাডাম।

সত্যি সব কিছু ভুলে যাই। ভুলে যাই আমি রাজবল্লভ পাড়ায় নেই। ভুলে যাই ছোটভাই, গোরা, অমিত আমাকে এখানে ছোট বৌদি বলে ডাকবে না। বলতে গেলে কেউই আমাকে বৌদি বলে ডাকে না। বাঙ্গালী এম. পি'রাও বৌদি বলেন না। এখানে কেউ কাউকে আত্মীয় বলে, শুভাকাঙ্খী বলে মেনে নিতে পারেন না। এখানে কেউ কারুর আপন নয়। এ যেন মনিকর্ণিকার মহাশ্মশান। এখানে সব আত্মীয়তার শেষ !

সৌমেন 'বৌদি' 'বৌদি' করে যখনই দিদিকে ডাকত তখনই আমি একটা শূন্যতা অনুভব করতাম। তিন ভাইবোনের মধ্যে ও সব চাইতে ছোট। আমাকে কে বৌদি বলবে ? অথচ বৌদি ডাক শুনতে আমার খুব ইচ্ছা করত। এখনও করে। বিকেলের দিকে অফিস থেকে ফেরার পথে ছোটভাই আর গোরা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে চিৎকার করত, ছোটবৌদি ! আসব নাকি ?

আমি ঘড়ি দেখতে দেখতে ওদের ঐ অদ্ভুত চিৎকার শোনার জন্য অপেক্ষা করতাম কিন্তু তবুও আমি বকুনি দিতাম, তোরা কি ভেবেছিস ছোটবৌদি মরেছে যে অমন করে চিৎকার করছিস ?

ছোট ভাই হাসতে হাসতে বলতো, আপনি মরলে তো ডালহৌসী পাড়া ছুটি হয়ে যেতো। তাহলে কি এত দেরী করে আসতাম ?

এবার না হেসে পারতাম না। বলতাম, আয়।

ওরা ঘরে এলেই মা বলতেন, তোরা আসবি বলে ছোট বৌমা জানলা দিয়ে চেয়ে থাকে, তা জানিস ?

ছোট ভাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, সে তো খুব স্বাভাবিক মাসিমা। এই আপনি, বড়দা আর আমরা ছাড়া ছোটবৌদির আপনজন কে আছে ? পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের মত আমাদেরও মটো সার্ভিস বিফোর সেলফ্।

একজনের স্নেহ বা ভালবাসা দিয়ে জীবন পূর্ণ হয় না। যে সন্তান শুধু বাবা-মার স্নেহ পায় কিন্তু বঞ্চিত থাকে বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে, সে কখনও সুখী হতে পারে ? শুধু স্বামীর ভালবাসা, প্রেম দিয়েও কোন মেয়ের পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি পাওয়া সম্ভব নয়। ভীম নাগের সন্দেশ বা জলযোগের পয়োধি খেয়ে কি জীবন কাটান যায় ? অসম্ভব, কল্পনাতীত। এই সংসারে এসে আমি এইজন্যই সুখী হয়েছিলাম যে এখানে সব কিছু পেয়েছি। স্বামী ? সত্যি অমন স্বামী ক'জনের ভাগ্যে হয় ? শিক্ষিত, সুপুরুষ, আদর্শবান। আর কি চাই ? তারপর দাদা। জন্ম জন্ম তপস্যা করে অমন দাদা পেতে হয়। কত দীর্ঘদিন ধরে কী নিদারুণ সংগ্রাম করেছেন কিন্তু কোন বিতৃষ্ণা, কোন অভিযোগ নেই কারুর বিরুদ্ধে। বরং তিনি সেজন্য খুশী, গর্বিত। সৌমেন যেদিন ফার্স্ট ক্লাস পেল, সেদিন গর্বে, আনন্দে দাদা নাকি ভীষণ কেঁদেছিলেন। সারা পাড়ায় মিষ্টি বিলিয়েছিলেন।

দিদি ? যেমন দাদা, তেমন দিদি। দিদির কথা আমি দাদার কাছ থেকেই শুনেছি। দাদা বলেছিলেন, জান বোন, তোমার স্বামীকে তোমার দিদি কি বলেছিলেন ?

আমি বললাম, কি বলেছিলেন ?

দিদি হঠাৎ দরজার গোড়ায় হাজির হয়ে বললেন, সে দুঃখ বুঝি আজও তুমি ভুলতে পারনি ?

দাদা দিদির কথায় কান না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি বলব ?

'হ্যাঁ বলুন।'

'ঠাকুরপো ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ায় উনি এতই গলে গিয়েছিলেন যে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কি দারুণ ফিলিংস দিয়ে ওকে বললেন, এখন দেখছি তোমার দাদার চাইতে তোমার সঙ্গে বিয়ে হলেই বেশী সুখী হতাম।'

দাদার কথা শেষ হতেই আমি আর দিদি এক দৌড়ে পালিয়ে যাই।

এই ভালবাসা, এই আনন্দ কি স্বামীর কাছে পাওয়া যায় ? আর শাশুড়ী ? ওর আগ্রহেই তো আমি এই সংসারে ঠাঁই পাই। উনিই তো দাদাকে প্রথম বলেছিলেন, হ্যাঁরে বড়, মেয়েটাকে একটু ভাল করে খেয়াল করিস তো !

দাদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একথা বলছ কেন মা ?

বলেছিলেন, আমার বড় ভাল লাগে মেয়েটাকে। আদর করে যেন আশ মেটে না।

দাদা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, দেখার কি আর দরকার আছে ?

সৌমেন যে অনেক আগেই এ্যাডভান্স বুকিং করে রেখেছে তা মা জানতেন না। তাই তো কারেন্ট বুকিং করার জন্য দাদাকে হুকুম করলে। 'বেশী দেরী করিস না। অন্য কারুর চোখে পড়লে এ মেয়েকে আর পাবি না।'

মা-দাদার অমতেও হয়ত সৌমেন আমাকে বিয়ে করত কিন্তু এই মর্যাদা, এই ভালবাসা কি পেতাম? উপরি পাওনা পেতে সবার ভাল লাগে। কথায় আছে আসলের চাইতে সুদ মিষ্টি! তাই তো ছেলেমেয়ের চাইতে নাতি-নাতনী বেশী আদরের, বেশী প্রিয় হয় সবার। উপরি পাওনা সবাই পায় না, পেতে পারে না। ভাগ্যের দরকার। আমি নিঃসন্দেহে ভাগ্যবতী। তা না হলে চারপাশ থেকে এত মানুষের ভালবাসা পাই?

ছোট ভাই আর গোরার চিৎকার তাই আমার আরো ভাল লাগত। ভাল লাগত আশোক মানুর 'ছোট মা' ডাক। কাকিমা ডাকলে কেউ কিছু বলত না, ভাবত না। কিন্তু ছোট মা ডেকে ওরা আমাকে যে মর্যাদা দিত, তার মূল্য এই জগতে অনেক। একটু মর্যাদা, একটু ভালবাসার জন্যই তো এই দুনিয়ায় সবাই পাগল। কাঙাল। আর আমি? অযাচিতভাবে সবকিছু পেয়েছি। সেই সব দিনের কথা কি আমি ভুলতে পারি?

মন্ত্রী-পত্নী বলে এখানে কেউ কেউ আমাকে ভয় করে, আবার কিছু স্বার্থপর মানুষ আমাকে খাতির করে। কিন্তু এখানে কেউ আমাকে অমন করে ভালবাসে না। কেউ ছোট বৌদি বলে চিৎকার করে না, কেউ ছোটমা বলে জড়িয়ে ধরে না। [ক্ষীণ যমুনার পাড়ে বাস করেও যে সামান্য রসের ধারার সন্ধান পেয়েছিলাম, তাও আস্তে আস্তে, রাজনীতির আবর্তে শুকিয়ে গেছে। যেটুকু আছে, তাও হয়ত থাকবে না। তাই তো ঐ দিনটার কথা এত বেশী করে মনে পড়ে। এত কিছু পেয়েও কত কি হারালাম। যা পেলাম, যা পাচ্ছি, তা সবাই দেখছে, দেখতে পায় কিন্তু যা হারালাম, যে রসের ধারা প্রাণহীন দিল্লীর মরুপ্রান্তরে এসে ফুরিয়ে গেল, হারিয়ে গেল, তা কেউ দেখতে পায় না। কেউ ধরতে পারে না। শুধু আমিই সে শূন্যতার জ্বালা, হারাবার বেদনা অনুভব করি।]

ইতিহাস যখন মোড় ঘোরে, তখন হঠাৎই হয়। অপ্রত্যাশিত, অভাবিতভাবে ইতিহাসের গতি পাল্টে যায়। কি আশ্চর্যভাবে গ্রীক আর রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হলো! ঠিক যেন সিনেমার মত! সারা পৃথিবী যাদের ভয়ে কাঁপত, তারাই একদিন ফানুসের মত ইতিহাসের পাতা থেকে উড়ে চলে গেল। সব সাম্রাজ্যের ইতিহাসই এক। এক ভাবে উঠেছে, একই ভাবে বিদায় নিয়েছে। কেন ফরাসী বিপ্লব? অক্টোবর বিপ্লব? একটা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ কিভাবে সারা জাতির মনে প্রাণে আগুন লাগিয়ে দিল। এইত সেদিনের ইতিহাস মোড় ঘুরল পার্ল হারবারে। নরম্যাণ্ডিতে। ইতিহাস হঠাৎ এ্যাবাউট টার্ন করে দাঁড়িয়েছে চীন-জাপান-ভারতবর্ষ থেকে সর্বত্র। সর্বকালে, সর্বযুগে। সূর্যের দেহ থেকে এক টুকরো জলন্ত জড় পদার্থ হঠাৎ একদিন ছিটকে এসেই পৃথিবীর জন্ম হয়। তাই কি পৃথিবীর সব কিছুই হঠাৎ হয়? হঠাৎ বৃষ্টি পড়ে, হঠাৎ ঝড় ওঠে, বন্যা হয়। মাটির তলার বীজ হঠাৎ অঙ্কুরিত হয়; কুঁড়ি অনেক দিন ধরে দেখা গেলেও ভোরের সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে ফুল ফুটে ওঠে হঠাৎই। মানুষের জন্ম-মৃত্যুও তো হঠাৎ। মুহূর্তের উত্তেজনায় মানুষ খুন করে, আবার ঐ একটি মুহূর্তের দুর্বলতায় মানুষ সর্বস্থ বিলিয়ে দেয়। রাজা ভিখারী হয়। আবার একটি মুহূর্তের একটি সাফল্যে ফকির রাজা হয়। সম্রাট হয়।

কংগ্রেস সেণ্ট্রাল ইলেকশন কমিটি যে পার্লামেণ্টের জন্য সৌমেনকে নমিনেশন দেবে, তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারি নি। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পি-টি-আই অফিস থেকে একজন রিপোর্টার টেলিফোন করে জানালেন, সৌমেন নমিনেশন পেয়েছে! রাজনীতি বলতে যা বোঝায়, তা ও কোনদিন করেনি। রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, পরিচয় ছিল নানা কারণে কিন্তু সেই সামান্য পরিচয়ের ভিত্তিতে ও যে পার্লামেণ্টের জন্য নমিনেশন পেতে পারে তা আমরা কেন, কেউই ভাবতে পারেন নি। কংগ্রেসে স্বার্থপর ও অশিক্ষিত মানুষের আধিপত্য ক্রমশঃ বাড়ছে বলে এবার কিছু অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ ছোটখাট ব্যবসাদারকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে। এদের হাতে ক্ষমতা এলে ভারতবর্ষের সুদিন আসবে।

উদ্দেশ্য মহৎ হলেও বাড়ীতে প্রায় সারা রাত ধরে আলোচনা চলল। দাদা শেষ পর্যন্ত বললেন, ব্যবসাদারের টাকা নিয়ে যত দিন পার্টি আর নেতাদের ভরন-পোষণ চলবে ততদিন সব ভাইস চ্যান্সেলার আর ডক্টরেটদের পার্লামেণ্ট-এ্যাসেমব্লীতে পাঠালেও বিশেষ কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না।

ওর চোখের সামনে তখন বিরাট বিরাট থামওয়ালা ঐ গোল পার্লামেণ্ট হাউসের ছবি ভাসছে। বললো, রাজনীতিকে নোংরামী মুক্ত করার জন্য কোন একটা পয়েণ্ট থেকে তো চেষ্টা শুরু করতে হবে।

দাদা বললেন, করো। আপত্তি নেই। তবে কি জানিস, ঐ একদল নন্-ম্যাট্রিক লীডার তোদের কিচ্ছু করতে দেবে না। তাছাড়া যে লঙ্কায় যায়, সেই রাবণ হয়। শেষ পর্যন্ত তুইও যে রাবণ হবি না, তার কি গ্যারান্টি?

দাদার কথা শুনে সৌমেন ঘাবড়ে গেল। বললো, তাহলে কি আমার উপর তোমার আস্থা নেই।

'আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত নিশ্চয়ই আস্থা আছে। ভবিষ্যতে আস্থা থাকবে কিনা সে তো তোর উপরেই নির্ভর করছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সৌমেন বললো, তুমি আশীর্বাদ কর যেন সারা জীবন তোমার......

ওর গলা দিয়ে যেন কথা বেরুচ্ছিল না। দাদা তাড়াতাড়ি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, গুড লাক! গো এ্যাহেড!

তারপর মাকে বললেন, মা, ছোটকে আশীর্বাদ কর ও যেন মাথা উঁচু করে এগিয়ে যেতে পারে।

এরপর ডাক পড়ল দিদির, এসো, তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আশীর্বাদ কর।

দিদি ওর সামনে গিয়ে বললেন, আগে আমাকে প্রণাম কর। তারপর প্রতিজ্ঞা কর এম. পি হলে প্রত্যেক মাসে আমাকে শাড়ী দেবে।

ও দিদিকে প্রণাম করে হাসতে হাসতে বললো, একটা দরিদ্র অধ্যাপককে ব্ল্যাকমেল করতে তোমার রুচিতে বাধছে না?

দিদি স্পষ্ট জবাব দিলেন, না।

ও বললো, ঠিক আছে শাড়ী পাবে।

দিদির পর্ব শেষ হতেই খেয়াল হলো এবার আমার পালা। আমি তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরুতে যেতেই দাদা ডাক দিলেন, একি তুমি চললে কোথায়? ছোটকে শুভেচ্ছা জানাবে না?

আমি দরজার কাছে থমকে দাঁড়াতেই দিদি বললেন, ওকে আর এখন শুভেচ্ছা জানাতে হবে না। পরে.......

দাদা বললেন, তুমি চুপ কর তো!

দিদি চুপ করলেন না। বললেন, উর্মি আমাদের সামনে কি শুভেচ্ছা জানাবে?

ঐ হুটো-একটা মিনিট যে আমার কিভাবে কেটেছিল, তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। দিদির কথায় দাদার হুঁস হলো। বললেন, আচ্ছা, তুমি পরেই শুভেচ্ছা......

দাদার কথা শেষ হবার আগেই আমি প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

সে রাত্রে আমরা হুজনে ঘুমোতে পারলাম না। আনন্দে, উত্তেজনায় কিছুতেই ঘুম এলো না। সকাল সাড়ে সাতটায় আমার ক্লাশ। মাত্র মাস তিনেক আগে দাদা নিজে চেষ্টা করে আমার জন্য এই পার্ট

টাইম লেকচারের চাকরি জোগাড় করেছেন। না ঘুমোলে বা দেরী করে উঠলে কলেজ যেতে পারব না জেনেও সে রাত্রে ঘুমোতে পারলাম না। দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে সারা রাত কথা বললাম। সৌমেন রাজনীতি করুক, আমি কোনদিন চাই নি কিন্তু সে রাত্রে ওর শুভ কামনা না করে পারলাম না।

দু'এক সপ্তাহ পরের কথা। ইলেকশনের বাজার তখন দারুণ গরম। দুই যুদ্ধ শিবিরেই তীব্র প্রস্তুতি। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য দু'পক্ষই শঙ্কিত। আমাদের বাইরের ঘরে সারা রাজবল্লভ পাড়ার ছেলেদের ভীড়। দিন-রাত ভীড়। সবাই কাজে ব্যস্ত। গোরা বা ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতেও ভয় লাগে। রোদ্দুরে পুড়ে পুড়ে এমন কি গোরার মত ফর্সা ছেলেও কালো হয়ে গেছে। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছোট ভাইয়ের চোখের নীচে কালি পড়েছে। সত্যি ওদের কষ্ট, পরিশ্রম দেখে নিজেদের বড় অপরাধী মনে হতো। আমার ভীষণ খারাপ লাগত। একদিন দিদিকে বললাম, দিদি, এ ইলেকশন না লড়লেই পারত।

'কেন?'

'দেখছ তো সবাই মিলে কি অমানুষিক পরিশ্রম করছে। তারপর রেজাল্ট কি হবে কে জানে? যদি........

দিদি হাসতে হাসতে বললেন, ঠাকুরপো জিতবেই।

'জিতবেই বললেই কি জেতা যায়?'

দিদি সেই নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত হাসি হেসে বললেন, আমি বলছি ঠাকুরপো জিতবেই। ঠাকুরপো না জিতলে তুই আর আমাকে দিদি বলে ডাকিস না।

দিদির কথায় আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। 'কিন্তু এত জোর করে তুমি একথা বলছ কিভাবে?'

'শুধু জিতবে না, ঠাকুরপো আরো অনেক উঠবে।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'জানি।'

'কিন্তু কিভাবে?'

তখনই দিদি কিছু বললেন না। পরে বলেছিলেন, মনে আছে অনেকদিন আগে তোর জন্ম সন-তারিখ ইত্যাদি জেনেছিলাম।

'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। মার কাছ থেকে জেনে এসে তোমাকে বলেছিলাম।'

'তোমার দাদা তোমাদের দুজনের কোষ্ঠি বিচার করে দেখেছেন...

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা কোষ্ঠি বিচার করেছেন?

দিদি হাসি মুখে বললেন, হ্যাঁ। উনি খুব ভাল বিচার করেন।

'সে কি? আমি তো জানি না।'

'বিশেষ কেউই জানে না। তবে আগে দারুণ হবি ছিল। এখন ছেড়ে দিয়েছেন।'

'তুমি তো আগে বলনি?'

'কি আর বলব? হঠাৎ খেয়াল হলে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে শুরু করেন।'

দাদার প্রতি বরাবরই আমার অগাধ বিশ্বাস। কেন জানি না, আমার মনের মধ্যে স্থির বিশ্বাস, দাদা অন্যায় করতে পারেন না, ভুল করতে পারেন না। দিদির কাছে যখন শুনলাম দাদা সৌমেনকে বলেছিলেন আমার জন্যই ওর সৌভাগ্য লাভ হবে, অভাবিত সম্মান-প্রতিপত্তি হবে, তখন ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা যেন আরো বেড়ে গেল।

সমারসেট মমের একটা কথা মনে পড়ছে, পিপ্‌ল আস্ক ইউ ফর ক্রিটিসিজ্‌ম্, বাট দে অনলি ওয়াণ্ট প্রেইজ্‌। কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। দাদার কাছে আমি বিচার চাইলেও আসলে প্রশংসাই শুনতে চেয়েছি। উনি আমাকে ভাল বাসেন, স্নেহ করেন, প্রশংসা করেন বলেই কি ওকে আমি এত শ্রদ্ধা করি?

না, না, তা কেন হবে? আমি বোধহয় অত হীন নয়। তাছাড়া যাঁকে মন প্রাণ দিয়ে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, তাঁকে নিয়ে এত টানা-টানি না করাই ভাল।

শেষ পর্যন্ত ইলেকশন শেষ হলো। পাঁচটার সময় ভোট নেওয়া শেষ হলেও পাড়ার ছেলেদের নিয়ে সৌমেন বাড়ীতে ফিরল এগারোটা নাগাদ। তখন ওদের কারুর চোখ-মুখের দিকে তাকান যাচ্ছে না। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে আর দুশ্চিন্তায় ওদের চেহারাই পাল্টে গেছে। এক এক গেলাস ঠাণ্ডা সরবৎ খেয়ে তখনই সবাই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে হিসাব-নিকাশ করতে শুরু করল। অনেক রকমভাবে হিসাব-নিকাশ করেও দেখা গেল চিন্তার কিছু নেই। অন্ততঃ যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু যুক্তি-তর্ক হিসাব-নিকাশ দিয়ে কি অশান্ত মনকে শান্ত করা যায়?

গেল না।

তবুও কি ওরা চুপ করে থাকতে পারে? বিনোদবাবু বললেন, ওসব অঙ্ক কষা ছাড়েন। দাদাবাবু জিতবেনই। না জিতলে ধর্ম মিথ্যে, মানুষের ভালবাসা মিথ্যে। তা যখন হতি পারে না, তখন এত চিন্তা কিসের?

কেউ কোন কথা বললো না। বিনোদবাবু একবার সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, গুরাবাবু, আপনি আর ছোট ভাই দাদাকে কাল সকালেই ট্রাকের বন্দোবস্ত পাকা করতি হবে। তা না হলি পরে মুশকিল হবে।

ছোটভাই বললো, হ্যাঁরে অমিত, শিবানী সঙ্ঘের ব্যাণ্ড পাওয়া যাবে তো?

অমিত বললো, শিবানী সঙ্ঘ, চৈতালী সঙ্ঘ আর মহামায়া স্পোর্টিং-এর ব্যাণ্ড পাওয়া যাবে তবে কালকে আর একবার মনে করিয়ে দিতে হবে।

গোরা বললো, হ্যাঁরে ছোটভাই, জ্ঞানদার গ্যারেজে ক'টা লরী আছে?

'দুটো।'

'আমাদের ক'টা লরী চাই?'

'মিনিমাম ছ'টা।'

গোরা একটু চিন্তিত হলো, আর চারটে কোথায় পাবি?

ছোট ভাই জবাব দিল, লরীর চিন্তা তোদের করতে হবে না। তুই বলাইকে বলে লাউড-স্পীকার ঠিক করে রাখিস। শেষকালে যদি কোঁ কোঁ করে তাহলে ও কিন্তু প্যাঁদানী খেয়ে মরবে।

সময় এগিয়ে চলল। এলো সেই শনিবার। যেদিন এই এ্যালবামের ছবিগুলো তোলা হয়। জ্ঞানদার গ্যারেজে সবকিছু রেডি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেলিফোন আসছে। ভালই। আমি, দিদি, মা, অশোক-মানু সব জট পাকিয়ে বসেছি টেলিফোনের পাশে। দাদা কাউন্টিং-এর ওখানেই আছেন। তবু যেন ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। যদি শেষ পর্যন্ত শশধরবাবুই জিতে যান? যদি তাঁর প্রশেশান এসে আমাদের বাড়ীর সামনে থামে? যদি শশধরবাবু আমাদের বাড়ীতে এসে সৌমেনের শুভেচ্ছা-সহযোগিতা প্রার্থনা করেন? যদি····

ভাবতে গিয়েই মাথাটা ঘুরে উঠল। অশোক-মান্নু বার বার জিজ্ঞাসা করছে, ছোটমা, রাঙ্গাকাকুকে নিয়ে কখন প্রশেশান বেরুবে?

আমি কোন জবাব দিই না। কোলের কাছে টেনে নিই। ওরা ক'মিনিট পরে আবার ঐ একই প্রশ্ন করে। তবু আমি কিছু জবাব দিই না। দিতে পারি না। মা বললেন, বেরুবে। এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? ভোট গোনা শেষ হলেই বেরুবে।

অশোক বললো, গুনতে এত সময় লাগে? আমরাও তো এর চাইতে তাড়াতাড়ি গুনতে পারি।

ফাইন্যাল রেজাল্টের খবর এলো তিনটের পর। দিদি বোধহয় বাথরুমে গিয়েছিলেন। আমিই টেলিফোনটা রিসিভ করলাম। দাদা পাগলের মত চিৎকার করে বললেন, ছোট জিতেছে। বুঝলে ছোট জিতেছে। সবাইকে খবর দাও।

দাদার টেলিফোন পাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমারও কি হলো। আমিও চিৎকার করে উঠলাম, পাগলের মত চিৎকার করে ঘোষণা করলাম, সৌমেন জিতেছে! সৌমেন জিতেছে!

এত উত্তেজিত হয়েছিলাম যে ভুলেই গিয়েছিলাম মা পাশে বসে আছেন। ভুলে গিয়েছিলাম, মা-দাদার সামনে কখনই ওর নাম ধরে কিছু বলি না। কিন্তু সেদিন বলেছিলাম। না বলে পারি নি।

এই এ্যালবামটা হাতে নিলেই সবকিছু মনে পড়ে। যত দিন বেঁচে থাকব, ততদিনই মনে পড়বে। ঐ অবিস্মরণীয় দিনের ইতিহাস আমি ভুলতে পারি না, পারব না।

তিন

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসে তখন আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্ব। হয় ক্রীতদাসের মত আত্মসমর্পণ অথবা শিরচ্ছেদ। রাজনীতির ভাষায় 'মিডল অফ দি রোড' বা মধ্যপন্থা বলে কিছু ছিল না।

বিচিত্র মানুষ ছিলেন এই আলাউদ্দীন খিলজী। অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। সাধারণ চাষ-আবাদ বা চাকরি-বাকরি করে জীবিকা চলেছে। তিন কুলে কোন কৃতি পুরুষ ছিলেন না কিন্তু ইনি যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে বিচরণ করছেন, তখন জানা গেল ওর গর্ভধারিণী রাজা রামমোহনের বংশধর আর বাবা বোধহয় বিদ্যাসাগর বা ঐ রকম কোন মহাপুরুষের বংশের ছেলে। আরো অনেক কিছু জানা গেল। জানা গেল, সিপাহী বিদ্রোহের সময় এর পূর্বপুরুষ ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করেছেন, বঙ্গভঙ্গের সময় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। আরো কত কি!

বঙ্গেশ্বর আলাউদ্দীন খিলজীকে সবাই ঘেন্না করত, নিন্দা করত, ভয় করত কিন্তু সামনা-সামনি সবাই ওকে সেলাম দিত। এমন কি সৌমেনও। অথচ ওকে সেলাম দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না সৌমেনের। আলাউদ্দীন খিলজীর অনুগ্রহ ছাড়া কোন বাঙ্গালী

দিল্লীর মসনদে ঠাঁই পেত না। সম্ভব ছিল না। ব্যতিক্রম শুধু সৌমেন। ইলেকশন রেজাল্ট বেরুবার কয়েক দিন পরেই ও প্রাইম মিনিষ্টারের অভিনন্দন পত্র পেল। চিঠির শেষে লিখেছেন, আই হোপ ইউ উইল হ্যাভ টাইম টু মীট মী সুন। প্রাইম মিনিষ্টারের চিঠি পেয়ে চমকে উঠল সৌমেন। দাদা বললেন, ছোট, তুই মন্ত্রী হচ্ছিস।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে দাদা? আমার মত ছোকরা লেকচারারকে প্রাইম মিনিষ্টার মন্ত্রী করলেই হয়েছে!' সৌমেন দাদার কথাটা উড়িয়েই দিল।

দাদা এবার হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার স্বামীকে তুমি যত বুদ্ধিমানই মনে কর না কেন........।

'আমি এমন কথা ভাবি, তা আপনাকে কে বললো?' আমিও হাসতে হাসতেই প্রতিবাদ জানালাম।

আমার প্রতিবাদ দাদা কানেই তুললেন না। 'ছোট-র মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকে! প্রাইম মিনিষ্টার দেখা করতে বলার মানেও বুঝল না।'

আমাদের বাড়ীর আমরা ক'জন ছাড়া প্রাইম মিনিষ্টারের এই চিঠির কথা কলকাতার আর একজন মাত্র জানতেন। আর কেউ না। এমন কি আলাউদ্দীন খিলজীও না।

পরের দিন সকালেই প্রাইম মিনিষ্টারের এ্যাডিশন্যাল প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ বাজাজ-এর ট্রাঙ্ককল এলো। 'স্যার, প্রাইম মিনিষ্টারের চিঠি পেয়েছেন?'

সৌমেন বললো, পেয়েছি।

'কবে রওনা হচ্ছেন? আজ?'

'আজ কি রিজার্ভেশন পাব?'

'আই এ্যাম এ্যারেঞ্জিং ইওর রিজার্ভেশন। আপনি কি একলা আসবেন?'

হঠাৎ সৌমেন জবাব দিল, না, সঙ্গে আমার স্ত্রীও যাবেন।

আমি আর দিদি পাশেই বসেছিলাম। ওর কথা শুনেই দিদি আমাকে একটা চিমটি কাটলেন। আমিও অবাক।

ও কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, প্রাইম মিনিষ্টার কিজন্য দেখা করতে বলেছেন জানেন কি ?

'আই এ্যাম সরি স্যার! আই হ্যাভ নো আইডিয়া!'

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফেয়ারলি প্লেস থেকে ইষ্টার্ন রেলের চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেনডেন্টের টেলিফোন এলো। কালকা মেলে একটা কূপে আমাদের জন্য রাখা হয়েছে। দাদা অফিসে ছিলেন। তাঁকে টেলিফোন করে সব জানান হলো। দাদা বললেন, আমি তাহলে লাঞ্চের সময় এসে যাচ্ছি।

একটা চাপা প্রত্যাশায় সবার মুখেই হাসি। সবারই ইচ্ছা সবাইকে খবরটা জানান হয় যে প্রাইম মিনিষ্টারের ডাকে সৌমেন দিল্লী যাচ্ছে। কিন্তু মিঃ বাজপেয়ী বলেছেন কেউ যেন খবরটা না জানে। সুতরাং জানান গেল না। শুধু বাবা-মাকে বলে এলাম একটু জরুরী কাজে আমরা দুজনে দিল্লী যাচ্ছি। বাবা-মা অবাক হলেন না। হাজার হোক জামাই এম. পি হয়েছে। সে যে এখন হরদম দিল্লী যাবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

সারাটা দিন দারুণ উত্তেজনা ও ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। বিয়ের পর এক সপ্তাহের জন্য দার্জিলিং গিয়েছিলাম দুজনে। গিয়েছিলাম মানে দিদি জোর করে পাঠিয়েছিলেন। দাদাও বললেন, যাও যাও, ঘুরে এসো। এই মন তো চিরকাল থাকবে না ; পরে যতই ঘুরে বেড়াও এই আনন্দ পাবে না।

তখন দার্জিলিং যাওয়া বড় ঝামেলার ছিল। সকরিকলি-মনিহারী ঘাটে ষ্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে আবার ট্রেনে চড়তে হতো। ওপারে গিয়ে ট্রেনে চড়ার জন্য প্যাসেঞ্জারদের যে কি দুর্ভোগ সহ্য করতে হতো, তা ভাবলেও গায়ে জ্বর আসে। তবু ভাল লেগেছিল। খুব ভাল লেগেছিল। সারাদিন দুজনে গল্প করতাম। শুধু বিকেলের

দিকে একটু ঘুরতে যেতাম। তাও হোটেলের আশেপাশে, কাছাকাছি। সাতদিন দার্জিলিং-এ ছিলাম অথচ কোন কিচ্ছু দেখিনি। কলকাতা ফিরলে দিদি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন কাটালে ?

আমি শুধু বললাম, ভাল।

'খুব বেড়ালে ?'

এবার দিদির প্রশ্নের জবাব দিল সৌমেন, বেড়াতে তো যাইনি বৌদি, গিয়েছিলাম দুজনে দুজনকে দেখতে, জানতে, চিনতে....

এইটুকু বলেই ও এগিয়ে দিদির কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, আর একটু তৃষ্ণা মেটাতে।

একটা কথা, একটা ঘটনা ভাবতে গেলেই কত কি মনে পড়ে। ভীড় জমে যায় মনের মধ্যে। এখানে এই বাংলোর ভিতরের বারান্দায় একলা একলা বসে থাকি আর নানা কথা ভাবি। কেউ বিরক্ত করে না। এখানে পরিচিত মানুষের অভাব নেই কিন্তু আপনজন দুর্লভ। তাইতো আপন মনে ভাবতে ভাবতে কোথায় ভেসে যাচ্ছিলাম!

দাদা-দিদি আর আমার বাবা-মা হাওড়া স্টেশনে এসেছিলেন আমাদের তুলে দিতে। ট্রেন ছাড়ার আগে দাদা বার বার করে বললেন, কাল রাত্রে পৌঁছবি। পরশু নিশ্চয়ই টেলিফোন করিস।

পরবর্তীকালে সৌমেনের সঙ্গে অনেকবার কলকাতা যাতায়াত করেছি। এছাড়া আরো অনেক জায়গায় গেছি কিন্তু সেই প্রথমবার দিল্লী আসার মত আনন্দ কোনদিন পাইনি। অবিস্মরণীয়।

'আচ্ছা তুমি হঠাৎ আমাকে সঙ্গে আনার কথা মিঃ বাজপেয়ীকে বললে কেন ?'

সৌমেন জানলা দিয়ে একটু বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর ঐ বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই বললো, কিছু ভেবে বলি নি, হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরে, ঐ ট্রেনে যেতে যেতেই ও বলেছিল, বিশ্বাস কর উর্মি, জীবনের সমস্ত আনন্দ-বেদনার সঙ্গে তোমাকে এমন করে জড়াতে চাই যে কোন কিছু না ভেবেও বললাম তোমাকে নিয়ে আসব।

কথাটা ঠিকই। মিথ্যা নয়।

তখনও আমাদের বিয়ে হয় নি, ইউনিভার্সিটিতেই পড়ছি। আশুতোষ বিল্ডিং-এর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ও আমাকে বললো, একটা অনুরোধ করব?

'কি অনুরোধ?'

'রাখবে তো?'

জানতাম অসম্ভব, অবাস্তব বা অন্যায় কিছু বলবে না। তাই স্বচ্ছন্দে বললাম, রাখব না কেন?

'কাল সারাদিন আমাদের ওখানে থাকতে হবে।'

একটু অবাক হলাম, সারাদিন?

'হ্যাঁ সারাদিন। কাল তো ছুটি।'

'ছুটি তো জানি কিন্তু সারাদিন থাকার কথা বলছ কেন?'

'কাল দাদার জন্মদিন। তুমি গেলে সত্যি খুব আনন্দ পাব। তাছাড়া বাড়ীর সবাইও...

পঞ্জিকার শুভদিনের নির্ঘণ্ট মিলিয়ে মানুষের জীবনে শুভদিন আসে না। দরকার নেই। দাদার জন্মদিন যে ওর জীবনেরও পরম শুভদিন, আনন্দের দিন, তা আমি জানতাম। আমি গিয়েছিলাম দাদার জন্মদিনে। সারাদিন কাটিয়েছিলাম ওদের বাসায়। আমি

যাবার জন্য ওরা সবাই যেমন আনন্দ পেয়েছিলেন, আমিও তার চাইতে কম আনন্দ পাইনি।

আরেকবারের কথা। মায়ের ব্লাডপ্রেসার অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় বেশ অসুস্থা হয়ে পড়েন। দাদা-দিদি সৌমেন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সৌমেন তো কদিন ইউনিভার্সিটিই এলো না। এরপর যেদিন এলো সেদিন আমাকে বললো, মায়ের শরীরটা বেশ খারাপ। তুমি একবার গেলে বোধহয় সবাই একটু....

ওর ঐটুকু কথা শুনেই আমি হেসে ফেলেছিলাম, আমি নিশ্চয়ই যাব। তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না।

ও এই রকমই ছিল। বরাবর। চিরকাল। স্বার্থপরের মত একা একা আনন্দ উপভোগ করত না; আমাকে অংশীদার করে নিত। আবার দুঃখের দিনে, বিপদ-আপদের মুখোমুখি হলেও আমাকে পাশে না পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারত না।

সেই আমাদের দুজনেরই প্রথম দিল্লী আসা। কোন ধারণা নেই দিল্লী সম্পর্কে। ট্রেন দিল্লীর যত কাছে আসতে আরম্ভ করল, আমাদের তত বেশী চিন্তা হতে লাগল। দিল্লী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামতেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এক্সকিউজ মী স্যার, আপনি কি প্রফেসর রয় ?

'হ্যাঁ।'

'আই এ্যাম ফ্রম প্রাইম মিনিষ্টার্স সেক্রেটারিয়েট....

'আই সী!'

ঐ ভদ্রলোকের গাড়ীতে আমরা কোটা হাউস গেলাম।

সরকারী অতিথিশালা। সুন্দর ব্যবস্থা। প্রাইম মিনিষ্টার্স সেক্রেটারিয়েটের ঐ ভদ্রলোক কেয়ার-টেকারকে ডেকে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'স্যার, উনি আপনাদের দেখাশুনা করবেন। কোন দরকার হলেই ওকে ডেকে বলবেন।'

কেয়ার টেকার মাথা দুলিয়ে দক্ষিণী ঢং-এ বললেন, ডোণ্ট ওরি স্যার! আই উইল বী এ্যাট ইওর সার্ভিস।

প্রাইম মিনিষ্টার্স সেক্রেটারিয়েটের ভদ্রলোক চলে যাবার আগে মিঃ বাজপেয়ীর টেলিফোন নম্বর দিলেন আর জানালেন, স্যার, কাল সকাল সাড়ে ন'টায় প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে আপনার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট।

আমরা দুজনে ওকে ধন্যবাদ জানাতেই উনি বিদায় নিলেন।

স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে বসে বসে প্রাইম মিনিষ্টারের প্রশংসা করছিলাম, এমন সময় মিঃ বাজপেয়ীর টেলিফোন এলো। 'স্যার, কোন অসুবিধা হয় নি তো?'

'না, না, কিচ্ছু অসুবিধে হয় নি।'

'ডিড ইউ গেট রাইস এ্যাণ্ড ফিস কারি?'

সৌমেন হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ, মাছের ঝোল-ভাতই খেয়েছি।

'আপনারা কি পছন্দ-অপছন্দ করেন তা তো জানতাম না, তাই কেয়ার-টেকারকে বলেছিলাম মাছ-ভাত নিশ্চয়ই রাখবে।'

'সো কাইণ্ড অফ ইউ।' সৌমেন কৃতজ্ঞতা জানাল।

'ওকথা বলবেন না স্যার। এটা আমাদের ডিউটি। তারপর বললেন, কাল সকাল ন'টার মধ্যেই আপনার কাছে গাড়ী পৌঁছবে। কাইণ্ডলি সওয়া ন'টার মধ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করবেন।

ন'টা নয়, সাড়ে আটটার সময়ই কেয়ার-টেকার এসে জানালেন, স্যার পি. এম-এর ওখান থেকে গাড়ী এসেছে।

বেশ মনে আছে সকাল বেলায় আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা

করলাম ও ধুতি-পাঞ্জাবি না স্যুট পরে প্রাইম মিনিষ্টারের কাছে যাবে। এখন না হয় সৌমেনের স্বাস্থ্য বেশ ফিরেছে কিন্তু তখন বেশ রোগা ছিপছিপে ছিল। ও স্যুট পরলেই আমার বেশী ভাল লাগত। আমি বললাম, স্যুট পরেই চলো।

'কিন্তু কংগ্রেস এম. পি. হবার পর স্যুট পরা কি ঠিক হবে?'

'তুমি তো আর প্রফেশন্যাল কংগ্রেসী নও! সবাই জানে তুমি একজন লেকচারার...

'কিন্তু....

'তাছাড়া প্রাইম মিনিষ্টার কনজারভেটিভ না। উনি নিশ্চয়ই স্মার্টনেস পছন্দ করবেন।'

সৌমেন স্যুট পরল আর আমি বাটিক প্রিণ্টের একটা সিল্কের শাড়ী পরলাম। ঘর থেকে বেরুবার আগে দুজনেই একবার পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখলাম। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বাঃ! তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে। ও ঝট করে এক হাত দিয়ে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললো, উর্মি! তুমি কি সারা জীবনই আমাকে মাতাল করে রাখবে?

গাড়ীর কাছে যেতেই ড্রাইভার ডান হাত তুলে সেলাম করে পিছনের দরজা খুলে দিল। কোটা হাউস থেকে সাউথ ব্লকে প্রাইম মিনিষ্টার্স অফিসে পৌঁছতে মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট লাগল। গাড়ী থেকে নামতেই মিঃ বাজপেয়ী অভ্যর্থনা করে উপরে নিয়ে গেলেন। গাড়ী থেকে নেমে উপরে যেতে যেতেই চারদিক দেখলাম ফিকে লাল স্যাণ্ড ষ্টোনে মোড়া রাষ্ট্রপতি ভবন আর সেক্রেটারিয়েট। কোনদিন তো এসব দেখি নি। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

কি মনে নেই আমার? প্রত্যেক দিনের প্রত্যেকটি ঘটনা তো দূরের কথা, প্রতিটি কথা পর্যন্ত আমার মনে আছে। আমরা দুজনে

ঢুকতেই প্রাইম মিনিষ্টার টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরলেন। দু'হাত দুজনের কাধে রেখে সোফার কাছে নিয়ে গেলেন। তিনজনেই বসলাম। পাশাপাশি। আমরা দু'পাশে, উনি মাঝখানে। সামান্য দুটো-একটা কথা বলার পর প্রাইম মিনিষ্টার হাসতে হাসতে বললেন, তোমার ছবির মত তুমি সুন্দর হবে, সত্যি আমি আশা করি নি।

সৌমেন কিছু বলার আগেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ওর ছবি দেখলেন কোথায়?

'কেন? কলকাতার নিউজ পেপারে।' তারপর আবার হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ছবি ছাপা হলে তো প্রফেসার আনকণ্টেষ্টেড রিটার্ণ হতো!

চা খাবার পর শুরু হলো আসল কথাবার্তা। 'আই এ্যাম এক্সট্রিমলি হ্যাপি যে তোমার মত ইয়াং শিক্ষিত ছেলে পার্লামেণ্টে এলো। ইন ফ্যাক্ট আমি চাই তোমাদের মত ছেলেরা কংগ্রেসে আসুক, কাজ করুক বাট বেঙ্গল কংগ্রেসের যা অবস্থা তাতে ইডিয়ট আর ইললিটারেট না হলে তো·······

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তার শেষে প্রাইম মিনিষ্টার আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ইফ ইউ পারমিট উর্মিলা, তাহলে এই ইয়াং প্রফেসারকে আমি মিনিষ্টার করতাম।

প্রাইম মিনিষ্টার এত সহজ, সরল, সুন্দর কথাবার্তা বললেন যে আমিও না বলে পারলাম না, নাউ আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড আপনি কিভাবে সারা দেশের মানুষকে হিপনোটাইজ করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব এলো, কিন্তু আমি কি তোমাকে হিপনোটাইজ করতে পেরেছি?

ঘর থেকে বেরুবার আগে প্রাইম মিনিষ্টার বললেন, ইউ উইল হ্যাভ ডিনার উইথ মী টু-নাইট।

এরপর এই সুখবরটা দাদা আর মাকে দেবার জন্য ও প্রাইম মিনিষ্টারের অনুমতি চাইল।

'অফ কোর্স। বাট ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ বেঙ্গল কংগ্রেস যেন জানতে না পারে।'

প্রাইম মিনিষ্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে। সৌমেন মিঃ বাজপেয়ীকে বললো, কলকাতায় একটা টেলিফোন করতাম।

'এক্ষুণি করবেন?'

'এক্ষুণি করলেই ভাল হয়।'

ভিজিটিং এ্যাম্বাসেডরদের ফাঁকা ঘরে আমরা বসলাম। সৌমেন মিঃ বাজপেয়ীকে দাদার অফিসের টেলিফোন নম্বর দিল।

'প্লীজ একটু ওয়েট করুন। এক্ষুণি লাইন পেয়ে যাবেন।'

সত্যি দু'এক মিনিটের মধ্যেই টেলিফোন বাজল। সৌমেন রিসিভার তুলতেই কে যেন বললেন, স্যার, মিঃ রয় ইজ হোল্ডিং। প্লীজ স্পীক অন।

দাদাকে সুখবর দিয়ে সাবধান করে দেওয়া হলো বাইরের কেউ যেন জানতে না পারে। প্রাইম মিনিষ্টার বারণ করেছেন। তারপর জানান হলো, রাত্রে প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে ডিনার খাব। দাদার সে কি আনন্দ! আমাকে বললেন, আমার কথা ঠিক হলো?

'আপনার কথা কি মিথ্যে হতে পারে? আপনার জন্যই তো সবকিছু।'

'আমার জন্য আবার কি হলো? সবই তোমার জন্য।'

'না, না, দাদা, ওকথা বলবেন না।'

'হাজার বার বলব, লক্ষ বার বলব। সত্যি বলছি বোন, সবই তোমার জন্য হচ্ছে। আরো অনেক কিছু হবে।'

'মাকে আর দিদিকে খবরটা দেবেন।'

'আমি এক্ষুণি বাড়ী যাচ্ছি।'

রাত্রে ডিনারের পর প্রাইম মিনিষ্টার জানালেন ওকে ইনফরমেশন—ব্রডকাষ্টিং-এর দায়িত্ব দিতে চান।

আরো দু'দিন দিল্লীতে কাটিয়ে আমরা কলকাতা ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে কলকাতার কাগজে সম্ভাব্য মন্ত্রীদের নাম বেরুতে শুরু করেছে। সেসব রিপোর্টের কোথাও সৌমেনের নাম ছিল না। ঐসব রিপোর্টে আলাউদ্দীন খিলজীর বিশ্বস্ত ক্রীতদাসদের নাম ছিল। আমরা হাসলাম। তারপর যেদিন দিল্লী থেকে সরকারীভাবে মন্ত্রীদের নাম বেরুল, সেদিন আলাউদ্দীন খিলজীর মাথায় বজ্রাঘাত হলো। পরে জেনেছিলাম উনি আমাদের বাড়ীতে টেলিফোন করেছিলেন কিন্তু তখন দাদা আর আমরা দুজনে কোটা হাউস থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনের পথে।

কলকাতার মত দিল্লীতেও আলাউদ্দীন খিলজীর দরবার বসত। কিছু রাজনৈতিক ক্রীতদাস ও চাটুদার সাংবাদিকরা দিল্লীর দরবারে নিত্য যোগদান করতেন। পরে, সৌজন্যের খাতিরে আমরা দুজনেই ওর ওখানে গেছি। হঠাৎ একজন সাংবাদিক জানতে চাইলেন, দাদা, এবার নতুন ক্যাবিনেট হবার সময় দিল্লী এলেন না কেন?

মোটা মোটা দুটো তাকিয়া জড়িয়ে দাদা কাত হয়ে বসলেন। 'তিনশো' এম. এল. এ. আর এম. পি-র ইলেকশন ম্যানেজ করে শরীরে আর কিছু ছিল না। তাছাড়া বয়স তো হচ্ছে।...

একজন ক্রীতদাস বললেন, ক'টা ছেলে-ছোকরা আপনার মত কুড়ি ঘণ্টা পরিশ্রম করতে পারে?

সঙ্গে সঙ্গে একজন চাটুদার সাংবাদিক বললেন, গতবার কংগ্রেস সেসনের পাঁচদিন তো দাদাকে ঘুমোতে দেখি নি।

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুচকি হাসলেন। 'এবার তাই প্রাইম মিনিষ্টারকে জানিয়েই ক'দিনের জন্য ডুব দিলাম।...

আবার বাধা। 'আচ্ছা দাদা, এবার বলুন তো কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন? আমরা এতগুলো সাংবাদিক হিমসিম খেয়ে গেলাম অথচ কিছুতেই জানতে পারলাম না।'

আবার বাধা। আবার একজন সাংবাদিক। 'আপনি শুনলে অবাক হবেন দাদা, আমাদের কলকাতার তিন-চারজন রিপোর্টার ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সব ফ্লাইটের আর রেলের সব ট্রেনের প্যাসেঞ্জার লিষ্ট দেখেও...

দাদা মুচকি হেসে বললেন, আমি জানি। আর এসব হবে জানতাম বলেই বাই কার গ্যাংটক চলে যাই।

দরবারের সমবেত ক্রীতদাস আর চাটুদাররা সমস্বরে বলে উঠলেন, বলেন কি?

দস্যু মোহন আর কিরীটি রায়ের মত দাদার রহস্য কেউ জানতে পারে না। উনি নিজেই সে রহস্য প্রকাশ করলেন। 'পর পর তিনদিন প্রাইম মিনিষ্টার আমাকে টেলিফোন করলেন। শেষের দিন তো প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কথা বললেন...

কে যেন একজন বলে উঠলেন, বাপরে বাপ!

এবার আলাউদ্দীন খিলজী সৌমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝলে সৌমেন, সবই জানতাম কিন্তু আগের থেকে কাউকে বলতে পারিনি। তাছাড়া তুমি এত ইয়াং যে উত্তেজনায়........

আমি আর সৌমেন শুধু হাসলাম।

এবার আলাউদ্দীন খিলজী আমাকে বললেন, তারপর উর্মিলা, কবে খাওয়াচ্ছ? স্বামীকে মন্ত্রী করে দিলাম, খাওয়াবে না?

'নিশ্চয়ই খাওয়াব।'

আমরা ঠিক উঠতে যাব এমন সময় দাদা সবাইকে সতর্ক করে দিলেন, প্রাইম মিনিষ্টার যে আমাকে গ্যাংটকে তিনদিন টেলিফোন করেছেন, এসব কথা যেন বাইরের কেউ জানে না। খবরের কাগজওয়ালাদের বললেন, তোমরা আবার কাগজে লিখে-টিখে দিও না। তাহলে অন্যান্য ষ্টেটে নানা রকম রিএ্যাকসন হবে।

একজন বশম্বদ বললেন, আমরা না বললেও সবাই জানে প্রাইম মিনিষ্টার আপনাকে রেগুলার কনসাল্ট করেন।

আরেকজন প্রভুভক্ত বললেন, প্রাইম মিনিষ্টার সব ব্যাপারেই দাদাকে কনসাল্ট করেন বলেই তো অন্যান্য ষ্টেটের লীডারদের গায় জ্বালা।

আরো কতজনে কত কি বললো। শেষে দাদার শেষ সতর্কবাণী, যাই হোক এসব কথা জানিয়ে কি দরকার? আমাদের কাজ হলেই হলো।

কলকাতায় থাকতে এই আলাউদ্দীন খিলজীর সঙ্গে সৌমেনের কোন যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে কিন্তু দিল্লীতে আসার পর মেলামেশা আসা-যাওয়া বেশ বেড়ে গেল।

ঐ নোংরা মানুষটার কথা আমি ভাবতে চাই না। তবু মনে পড়ে। দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। না, আর না।

আজ যাই ভাবি না কেন, সেই সেদিন যখন সৌমেন রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ গ্রহণ করল, তখন আনন্দে, গর্বে আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আর দাদা? আনন্দে যে কোন মানুষ অমন করে

চোখের জল ফেলতে পারে, তা জানতাম না। ওর শপথ নেওয়ার পর দাদা আমাকে বললেন, জান বোন, আজ আমার মনে হচ্ছে আমিই দিল্লীর সম্রাট। আমিই প্রধানমন্ত্রী। এ জীবনে আমার আর কোন প্রত্যাশা নেই।

সেদিন রাত্রে প্রাইম মিনিষ্টার্স হাউসে সমস্ত মন্ত্রীদের ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল। আমাদের দুজনের কার্ড আগেই এসেছিল। রাষ্ট্রপতি ভবনে সুয়ারিং-ইন সেরিমণি শেষ হবার পর সৌমেন প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে দাদার পরিচয় করিয়ে দেয়। 'হি ইজ নাইদার এ সাধু নর এ পলিটিসিয়ান বাট এমন পরোপকারী আদর্শবাদী মানুষ আমি দেখি নি......

প্রাইম মিনিষ্টার বললেন, মাষ্ট বী সো তা না হলে তোমার মত ভাই তৈরী হয়? এবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, উর্মিলা, হাউ ডু ইউ লাইক......

আমি বললাম, শপথ নেবার সময় আনন্দে দাদা বাচ্চা ছেলের মত কাঁদছিলেন।

প্রাইম মিনিষ্টার মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'সামবডি মাষ্ট লাভ। তা নাহলে মানুষের মত মানুষ তৈরী হয় না।'

সৌমেন অফিসারদের সঙ্গে মিনিষ্ট্রিতে চলে গেল। আমি আর দাদা ফিরে এলাম কোটা হাউসে। এক ঘণ্টার মধ্যেই একজন স্পেশ্যাল মেসেঞ্জার এসে প্রাইম মিনিষ্টারের ডিনারের জন্য দাদার ইনভিটেশন কার্ড দিয়ে গেল।

কি সব আনন্দের দিন গিয়েছে! বোধহয় বিয়ের দিনেও এত আনন্দ হয়নি। লাঞ্চের সময় সৌমেন এলো। তিনজনে এক সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম। কলকাতায় টেলিফোন করে মা আর দিদির সঙ্গে সবাই কথা বললাম। অশোক—মানু স্কুলে ছিল। তখন কথা বলা হলো না।

ভারত সরকারের মিনিষ্টার যে কি সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। থাকবে কেমন করে? কোনদিন তো রাজনীতি করিনি। মন্ত্রীদের পিছনে পিছনেও ঘুরে বেড়াইনি। কলেজে পড়েছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, আড্ডা দিয়েছি কফি হাউসে, ওয়াই-এম-সি-এ, বসন্ত কেবিনে। ঘুরে বেড়িয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে। দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট তো দূরের কথা, রাইটার্স বিল্ডিং-এর ভিতরে কোন-দিন যাই নি। এখনকার মানুষ চিড়িয়াখানা বা বোটানিক্যাল গার্ডেন বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের মত মন্ত্রীদের দেখার জন্য রাইটার্স বিল্ডিং-এও যায় কিন্তু আমাদের সে আগ্রহ কোনদিন হয় নি। এবার বুঝলাম মন্ত্রী হওয়া কি ব্যাপার।

সরকারীভাবে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম প্রচারিত হলো সন্ধ্যার পর সাতটা নাগাদ। পনের মিনিটের মধ্যেই ইন্‌ফরমেশন ব্রডকাষ্টিং মিনিষ্ট্রির আই-সি-এস সেক্রেটারীর টেলিফোন এলো, স্যার আই এ্যাম এক্সট্রিমলি হ্যাপি যে আপনার মত মিনিষ্টার পাব। আরো কি যেন বললেন। শেষে অনুমতি চাইলেন, স্যার একটু আসতে পারি?

'নিশ্চয়ই।'

'কখন আসব স্যার?'

'পারেন তো এখুনি আসুন।'

দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই দরজায় আওয়াজ হলো। আমি দরজা খুলতেই একজন চাপরাশী সেলাম করে বললো, সেক্রেটারী সাহাব এসেছেন।

'ভিতরে পাঠিয়ে দাও।'

দরজা বন্ধ হলো। আবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ করার আওয়াজ। সেক্রেটারীর আগমন সঙ্কেত। সেক্রেটারী সাহেব একটা বিরাট ফুলের তোড়া নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সৌমেন এগিয়ে গেল, আসুন, আসুন।

ফুলের তোড়া সৌমেনকে দিয়ে সেক্রেটারী সাহেব বললেন, হার্টি কনগ্রাচুলেশনস্ স্যার! আই হোপ......

সৌমেন বললো, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—ইনি আমার দাদা—আর আমার স্ত্রী।

সেক্রেটারী সাহেব আমাদের নমস্কার করলেন।

দাদা বললেন, বসুন।

সেক্রেটারী সাহেব বসতেই দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, কনফিডেন-সিয়্যাল কিছু আলোচনা করলে বলবেন আমরা পাশের ঘরে যাব।

'নো স্যার নট এ্যাট অল। শুধু আমার রিগার্ডস জানাতে এসেছি আর প্রিলিমিনারী একটু বিধিব্যবস্থার কথা বলব........

চার কাপ চা বা কফি দেবার কথা বলার জন্য বারান্দায় বেরুতেই দেখি দু'জন চাপরাশী ও কয়েকজন লোক সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াল। হাত তুলে সেলাম করল। একজন জিজ্ঞাসা করল, কিছু দরকার?

'হ্যাঁ চার কাপ কফি চাই।'

'এক্ষুণি দিতে বলছি।'

তখনও সৌমেন মন্ত্রী হয় নি, শুধু ঘোষণা হয়েছে। আমি চাপরাশী আর লোকজন দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না।

কফি খেতে খেতে সেক্রেটারী সৌমেনকে ব্যবস্থাদির কথা বললেন, স্যার আপনার গাড়ী থাকল। ড্রাইভার, চাপরাশী-বেয়ারা সব আছে এখানেই। তাছাড়া এখনও আপনি পার্সোন্যাল ষ্টাফ এ্যাপয়েন্ট করেন নি, তাই একজন সেক্সন অফিসারকে রেখেছি যদি আপনার কোন দরকার হয়......

'আজ আর কি দরকার ?' সৌমেন বললো।

'স্যার ওরা না থাকলে লোকজন এসে আপনাকে বিরক্ত করতে শুরু করবে। তাছাড়া টেলিফোন আর টেলিগ্রামের জন্য পাগল হয়ে যাবেন......

আমরা সবাই একটু হাসলাম।

'অল ইণ্ডিয়া রেডিও আর প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর কয়েকজন অফিসার একটু কাজের জন্য নিশ্চয়ই আপনাকে বিরক্ত করবে......

'না, না, বিরক্তর কি আছে ?'

'আফটার অল আপনি তো ওদেরই মিনিষ্টার !'

'তা তো বটেই।'

'স্যার, আমি সকাল সাড়ে আটটায় আসব। তারপর আপনাকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবন যাব। সুয়ারিং-ইন-এর পর আপনাকে নিয়ে মিনিষ্ট্রিতে আসব। সব অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করাবার পর কয়েকটা জরুরী ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলব......

'ঠিক আছে।'

'তারপর আপনি সুবিধা মত অল ইণ্ডিয়া রেডিও, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, পাবলিকেশন ডিভিশন ইত্যাদি অফিস ভিজিট করবেন........

দরজায় নক্ করার আওয়াজ হলো। সৌমেন নিজেই এগিয়ে গেল। চাপরাশী সেলাম দিয়ে বললো, সুপারিনটেনডেণ্ট অফ পুলিশ সাব আয়া।

'পাঠিয়ে দাও।'

সৌমেন বসতে না বসতেই এস. পি ঘরে ঢুকলেন। প্রথমে সৌমেনকে, পরে সেক্রেটারীকে স্যালুট করলেন। 'স্যার, আমি এস-পি সিকিউরিটি........

'বসুন।'

'এখন আর বসব না স্যার। শুধু জানাতে এসেছি আপনার সিকিউরিটি গার্ড রেখে যাচ্ছি। ইফ ইউ কাউণ্ডলি পারমিট, তাহলে ওকে চিনিয়ে দিতাম।'

ও গম্ভীর হয়ে বললো, হ্যাঁ আনুন।

সিকিউরিটি গার্ডকে পরিচয় করিয়ে দিয়েই এস-পি বিদায় নিলেন। তার আগে সৌমেন ও সেক্রেটারীকে স্যালুট করে বললেন, হঠাৎ এসে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন। এনি মোর সার্ভিস স্যার?

'নো থ্যাঙ্ক ইউ।'

যেসব পরিবার খুব বড়, যাদের বাড়ীতে অনেক লোক, নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকেন, সেসব পরিবারের লোকজনদের নানারকম সংক্ষিপ্ত নামকরণ হয়। দেওঘরের জ্যাঠা, বর্ধমানের ভাসুর, দার্জিলিং-এর ঠাকুরপো বা পদ্মপুকুরের মাসি। নামকরণ অবশ্য নানারকমের হয়। রাঙা বৌদি, সোনা কাকিমা বা ঐ ধরণের কিছু। ভারত সরকারও এক বিরাট জয়েন্ট ফ্যামিলী। বোধহয় বৃহত্তম। এখানে সবার নামেরই সংক্ষিপ্তকরণ হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিপ, প্রাইম মিনিষ্টার পি. এম, ফিনান্স মিনিষ্টার এফ, এম····। মিনিষ্টার অফ ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং হলো এম. আই. বি। প্রিন্সিপ্যাল ইনফরমেশন অফিসার পি. আই. ও। ডি. জি—এ. আই. আর ও আরো কত কি। তখন এসব জানতাম না, এখন জেনেছি।

সেদিন রাত্রে সেক্রেটারী থাকতে থাকতেই পি. আই. ও. ডি-জি এ-আই-আর, ডি. এন. এস ও আরো কয়েকজন এলেন।

'স্যার আপনার সর্ট লাইফ স্কেচ চাই।' পি. আই ও আবেদন জানালেন।

সৌমেন হাসল, দেয়ার ইজ নাথিং মাচ····

'কি যে বলেন স্যার!'

'এক্ষুণি চাই?' ও জানতে চাইল।

'আজই প্রেস রিলিজ দিতে হবে।'

সৌমেন ভাবছিল।

দাদা বললেন, আমাকে এক টুকরো কাগজ দিন, আমি লিখে দিচ্ছি।

এবার ডি. জি এ-আই-আর ও ডিরেক্টর অফ নিউজ সার্ভিসেস (ডি. এন. এস) আব্দার করলেন, স্যার, রেডিও নিউজ রীলের জন্য দুটো-একটা কথা বলতে হবে।

'এখনই কি বলব?'

ডি. এন. এস বললেন, কাইগুলি সে সামথিং এ্যাবাউট ইওর এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট এ্যাণ্ড কি ভাবছেন....

সেক্রেটারী হাসতে হাসতে বললেন, ডু প্লীজ সে এ ফিউ ওয়ার্ডস স্যার!

কি আর করবে সৌমেন? রাজী হলো। সঙ্গে সঙ্গে টেপ রেকর্ডার নিয়ে আরো দু'জন ভিতরে এলেন। ও দু'চার কথা বললো, প্রাইম মিনিষ্টার সত্যি একজন বিচিত্র মানুষ! কোনদিন আলাপ পরিচয় নেই তবু তিনি আমাকে মন্ত্রী করলেন....

আমি আর আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কখন ব্রডকাষ্ট হবে?

'কাল রাত সাড়ে আটটায়।'

সেক্রেটারী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ট্রানজিস্টার সঙ্গে এনেছেন?

আমি বললাম, না।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডিরেক্টর জেনারেল বললেন, আমি ব্যবস্থা করছি।

পরের দিন সকালে একটা বিরাট রেডিও এসেছিল। আর সেইদিন রাত্রেই ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট থেকে মোহর করা কভারে ব্রীফ এলো। নানারকমের ব্রীফ। সুয়ারিং-ইন সেরিমণিতে কিভাবে

কি হবে, মিনিষ্টার অফ ষ্টেটের দায়-দায়িত্ব, মাইনে, এ্যালাউন্স সম্পর্কে সরকারী নিয়ম, ট্যুর করার বিধি ও আরো কত কি। আমরা তিনজনে অনেক রাত পর্যন্ত ঐসব পড়েছিলাম। আমি বললাম, বাপরে বাপ! মন্ত্রীদের জন্য কত কি?

দাদা বললেন, হাজার হোক সেন্ট্রাল মিনিষ্টার। যা তা ব্যাপার নাকি?

এরই মধ্যে টেলিফোন আর টেলিগ্রাম আসতে শুরু করেছে। রেডিওতে এ্যানাউন্সমেণ্ট হবার পর পরই। অধিকাংশই কলকাতা থেকে। তবে দিল্লীরও বহুলোক টেলিফোন করল। পরিচিতর চাইতে অপরিচিতরাই বেশী। কয়েকজন এম. পি.ও টেলিফোন করলেন। অভিনন্দন জানালেন মন্ত্রীরাও।

মানুষের জীবনে একটা দিন কিছুই না। তবু মাঝে মাঝে মানুষের জীবনেই এমন একটা দিন আসে যখন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। অবিস্মরণীয় হয় সারা জীবনের জন্য। ঐই একটি দিন—চব্বিশ ঘণ্টা—সরকারীভাবে মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা থেকে শপথ নেবার দিন রাত্রি পর্যন্ত সৌমেনের জীবনকে একেবারে মোড় ঘুরিয়ে দিল। পাল্টে দিল। নতুন করে জন্ম হলো। চারশ' পঁচিশ টাকার লেকচারার সৌমেন রায় হারিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল, নিঃশেষ হয়ে শেষ হলো; জন্ম নিল কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য মন্ত্রী সৌমেন রায়।

যে সৌমেন বাসে চড়ে কলেজে যাতায়াত করত, সেই সৌমেনের জন্য বড় ডজ গাড়ী এলো। যার বাড়ীতে ঠিকে ঝি কাজ করে,

দিন রাত্রের চাকর রাখতে পারে না, সেই তার জন্য লাইন করে চাপরাশী বেয়ারা দাঁড়িয়ে। রিভলবারধারী সিকিউরিটি গার্ড। হঠাৎ ওর জীবনের দাম বেড়ে গেল। নাকি শক্রর সংখ্যা বাড়ল? আমাদের কলকাতার বাসায় কোনকালেই টেলিফোন ছিল না। ইলেকশনের জন্য টেম্পোরারী টেলিফোন নেওয়া হয়েছে। এক রাত্রের মধ্যে এই কোটা হাউসের ঘরেই দুটো টেলিফোন বসল। তাও নিজের ডায়াল ঘোরাতে হবে না। বোতামটা টিপলেই পাশের ঘরে খিদমত গারীর দল বসে আছে। তারাই ডাইরেক্টরী খুঁজে নাম্বার জেনে ডায়াল ঘুরিয়ে দেবে। শপথ নেবার পর থেকে সারা দিনের মধ্যে কয়েকবার কলকাতায় টেলিফোন করা হয়েছে। অপেক্ষা করতে হয় নি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে লাইন পাওয়া গেছে।

প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিষ্টার, ক্যাবিনেট মিনিষ্টার, আই-সি-এস সেক্রেটারী, বড় ডজ গাড়ী, ড্রাইভার-চাপরাশী-সিকিউরিটি গার্ড, টেলিফোন, টাঙ্ক কল, পার্সোন্যাল ষ্টাফ....! সব তালগোল পাকিয়ে গেল মাথার মধ্যে। হঠাৎ সারা দেশটা যেন আমাদের জমিদারীতে পরিণত হলো। যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু গোলাম। শুধু সেলাম। শুধু খাতির। সম্মান। আমি, আমরা মাতাল হয়ে গেলাম। ভাবতে পারলাম না, বুঝতে পারলাম না সব কিছু আছে, সম্মান, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, নেই শুধু ভালবাসা। দরদী মন, স্নেহকাতর প্রাণ। অবকাশই পেলাম না হিসাব-নিকাশের। জোয়ারের জলের মুখে দাঁড়িয়ে ভাবতে পারলাম না শিথিল হলো আমাদের অস্তিত্ব।

দাদা পরদিনই চলে গেলেন। অনেকবার অনুরোধ করা হলো, তবু থাকলেন না। বললেন, না, না, আর না। বেশীদিন থাকলে ঘর-সংসার চাকরি-বাকরিতে মন দিতে পারব না।

অনেক সুখের মধ্যেও আমি যেন একটু ভয় পেলাম। এত মানুষের মধ্যেও আমি যেন একটু একলা হয়ে গেলাম।

চার

কলাতলায় টোপর মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে বিয়ে করার জন্য আজকাল অনেকেই হাসাহাসি করেন। সাত পাকে বাঁধার দিনও নাকি ফুরিয়েছে। তাই বোধহয় লাল সুতো দিয়ে জামাই-এর মাপ নেওয়া, দুধ-আলতা দিয়ে নতুন বউ-এর পা ধুইয়ে দেওয়া বা বাসর ঘরে কড়ি খেলার মত স্ত্রী আচারের বিরুদ্ধে আধুনিকরা গর্জন করেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময়ই আমাদের ক্লাসের দু'তিনটি মেয়ের বিয়ে হলো। ওদের বিয়ের সময় এইসব স্ত্রী আচারের জন্য অনেক বরযাত্রীকেই টিপ্পনী কাটতে শুনেছি। চৈতালীর বর তো নিজেই রেগে গেল। আমাদের বিয়ের সময়ও কিছু কিছু মন্তব্য আমার কানে এসেছে। আমি কিছু বলি নি। তখন তো আমি লাল বেনারসী পরে কনে বৌ। তখন কি তর্ক করা যায়? কফি হাউস বা ওয়াই-এম-সি-এ রেষ্টুরেণ্ট বা বসন্ত কেবিন হলে বলে দিতাম, আমার ভালই লাগে। বেশ সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে, মিলন যজ্ঞের প্রস্তুতি পর্ব মধুর করে।

সে যাই হোক, দিল্লীতে সরকারী শুভ কাজে যে 'স্ত্রী আচার' দেখলাম তা দেখে তো আমি তাজ্জব। গণ্ডগ্রামের কট্টর গোড়া

ব্রাহ্মণ বাড়ীর বিধবার চাইতেও বোধহয় অনেক বেশী নিয়ম-কানুন প্রেসিডেণ্টকে মানতে হয়। সব কিছুরই নিয়ম, অথবা বিধি, অথবা চিরাচরিত প্রথা। আগে জানতাম না কিন্তু আস্তে আস্তে জেনেছি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে, বিশেষ বিশেষ অতিথির সঙ্গে কথা বলার জন্যও রাষ্ট্রপতিকে সরকারী নির্দেশ মানতে হয়। প্রাণ খুলে কথা বলার অধিকার তো দূরের কথা, হাঁটা-চলা ওঠা-বসারও নিয়ম বা নির্দেশ মানতে হয় রাষ্ট্র প্রধানকে। নতুন কনে বউ বা বিধবাদের জন্য যত কঠোর নিয়ম-কানুনই থাক না কেন, তবু তারা হাসতে পারে, কাঁদতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈব চ নৈব চ।

মন্ত্রীদের জন্যই কি কম 'স্ত্রী আচার'? কম নিয়ম-কানুন? কম রীতি-নীতি? প্রথম প্রথম সব কিছুতেই আমরা অবাক হতাম। হাসতাম।

তখনও আমরা কোটা হাউসে আছি, জনপথের এই বাংলোয় আসি নি। প্রায় রোজই সন্ধ্যার পর আমরা দুজনে কনটপ্লেসের দিকে বেড়াতে যেতাম। গাড়ীতেই যেতাম কিন্তু কনটপ্লেসের কোথাও গাড়ী থেকে নেমে দুজনে ঘুরে বেড়াতাম। কখনও দোকানগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতাম, জিনিষপত্র দেখতাম, দেখতাম লোকজন গাড়ী-ঘোড়া। সব কিছুই তো নতুন, দেখতে ভালই লাগত। কখনও কখনও মাঝখানের পার্কে বসে গল্প করতাম, চিনেবাদাম বা আইসক্রীম খেতাম। একদিন গল্প করতে করতে একটু রাত হয়ে গেল। আশেপাশে বিশেষ লোকজন ছিল না। হঠাৎ সৌমেনের খেয়াল হলো গান শুনবে। আমি দিদির মত কোনদিন কোন মাস্টারের কাছে গান শিখিনি; তবু দিদির গান শুনে শুনেই গোটা কতক রবীন্দ্র সঙ্গীত আর অতুল প্রসাদের গান গাইতে পারতাম। ঐসব গান যে ও কতবার করে শুনেছে তার হিসাব নেই।

'আমি কি গান শিখেছি যে তোমাকে সারা জীবন ধরে গান শোনাব?'

'না শিখেই যা গাইতে পার তাতেই আমার মন ভরে যায়।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, দেখ, মন্ত্রী হবার পরও এই ভাল লাগা থাকে কিনা।

সামনা-সামনি বসে কথা বলছিলাম। সৌমেন হঠাৎ দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে মাথায় মাথা লাগিয়ে বললো, এ কথা বলসে কেন উর্মি? আমি কি এই ক'দিনে পাল্টে গেছি?

'আমি কি তাই বলেছি?'

'মন্ত্রীত্ব করতে গিয়ে আমি যদি কোনদিন পাল্টে যাই, তাহলে বলো। আমি সেই দিনই রিজাইন করে কলকাতা ফিরে যাব।'

আমি ওর কথা শুনে না হেসে পারলাম না।

তখনও দু'হাত দিয়ে ও আমার গলা জড়িয়ে আছে। বললো, তুমি হাসছ? কিন্তু বিশ্বাস কর, মন্ত্রীত্বের প্রতি কোন মোহ আমার নেই; মন্ত্রীত্বের চাইতে তোমার আকর্ষণ আমার কাছে অনেক বেশী, অনেক বড়।

অনেকক্ষণ দুজনে বেশ নিবীড়ভাবে কাটিয়ে উঠলাম। ও আমার একটা হাত ধরে দোলাতে দোলাতে হাঁটছিল। দু'চার পা এগুতেই ঐ গাছের তলার লোকটা আমাদের সেলাম দিল। আমরা দু'জনে হতবাক। গান-ম্যান? সিকিউরিটি গার্ড? মন্ত্রীদের কি ব্যক্তিগত জীবন থাকতে পারে না?

প্রথম প্রথম সৌমেন অফিসের সব কিছু নিয়েই আমার সঙ্গে গল্প করত। 'জান উর্মি, চিঠিপত্র সই করাবার জন্য সিগনেচার প্যাড আছে। প্যাডের পাতা পর্যন্ত আমাকে ওল্টাতে হয় না, প্রাইভেট সেক্রেটারী পাশে দাঁড়িয়ে পাতা উল্টে দেয়।'

'কেন? তুমি কি পাতা উল্টে সই করতে পার না?'

'পারলেও ওরা করতে দেয় না। আমাকে খুশী করার জন্য সব সময় ওরা সবাই পাগল।'

মনে পড়ে সৌমেনের ট্যুর প্রোগ্রাম দেখে আমার কি হাসি! হাসব

না ? প্রোগ্রাম মানে তো ডিপারচার দিল্লী, এ্যারাইভাল দামদাম ; আবার ডিপারচার দামদাম, এ্যারাইভাল দিল্লী। কিন্তু এই প্রোগ্রামেরই কপি গেল ষাট-সত্তর জনের কাছে। সেক্রেটারী টু দি প্রেসিডেন্ট, প্রাইভেট সেক্রেটারী টু দি প্রাইম মিনিষ্টার, সেক্রেটারি টু দি ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে চব্বিশ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, এরোড্রাম অফিসার ও আরো কতজনের কাছে যে কপি গেল, তা দেখে আমার কি হাসি! আমি হাসলে কি হয়। আস্তে আস্তে ঐ প্রোগ্রাম আরো অনেকের কাছে যেতে শুরু করল। এম. পি. এম. এল. এ. ডজন খানেক কংগ্রেস অফিসে, সৌমেনের ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের কাছেও ট্যুর প্রোগ্রাম পাঠান শুরু হলো।

সৎ, আদর্শবান থাকার জন্য তখন কত কথা, কত আলোচনা। আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সৌমেন প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বললো, লুক হিয়ার, কেউ যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে না যায়। আর হ্যাঁ, সব চিঠিপত্র আমাকে দেখাতে ভুলবেন না........

'সব চিঠিপত্রই তো দেখাই স্যার!'

'একদিন বা তু'দিনের মধ্যে সব চিঠির জবাব যাবে.......

'আচ্ছা স্যার।'

'ফাইল যেন না জমে। প্রত্যেকটা ফাইল আমি সেম ডে ডিসপোজ অফ করে দেব, তবে....

'তবে কি স্যার?'

আমি সৌমেনের পাশেই বসে আছি। প্রাইভেট সেক্রেটারী একটা নোট বই আর কলম নিয়ে বলির পাঠার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছেন।

'তবে কোন অফিসার যেন বেশী দেরী করে ফাইল না পাঠান....

'আচ্ছা স্যার।'

'বাড়ীতে আমি ফাইলপত্র আনব না। ওসব অফিসেই সারতে চাই।'

সৌমেন আমাকে বলতো, জান উর্মি, কয়েকজন মিনিষ্টারের বাংলো ঘুরে আমার ভীষণ খারাপ লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

'বাংলোগুলোকেও ওরা অফিস করে ফেলেছে। অফিস ইজ অফিস এ্যাণ্ড বাংলো ইজ বাংলো।'

'তা তো বটেই।'

'বাংলোতে মন্ত্রী থাকে বলেই অফিস হবে কেন? বাংলো হচ্ছে ফ্যামিলির জন্য এ্যাণ্ড ফর ফ্রেণ্ডস এ্যাণ্ড রিলেসান্স।'

আরো কত কথা! কত স্বপ্ন!

বিষণ্ণ মুখে সৌমেন বললো, আমি সব মিনিষ্টারদের বাংলো ঘুরিনি, কিন্তু যে ক'টা দেখেছি তাতেই ভীষণ অবাক হয়েছি।

'কেন?'

'আমরা গরীব দেশের মন্ত্রী। তাছাড়া আমরা সবাই তো অর্ডিনারী মিডল ক্লাশ ফ্যামিলির থেকে এসেছি। মন্ত্রীদের বাংলোগুলোকে রাজা-মহারাজার প্যালেসের মত সাজাবার কোন মানে হয়?'

'খুব সাজান-গোছান বুঝি?' আমি জানতে চাই।

'তুমি ভাবতে পারবে না উর্মি, কি দারুণ দামী দামী সোফা-কার্পেট-কার্টেন-ফার্ণিচার দিয়ে বাংলোগুলো সাজান।'

আমি ছোট্ট করে নিজের মতামত জানাই, খুব বেশী দামী দামী জিনিষপত্র দিয়ে বাড়ী সাজালেই কি ভাল লাগে?

স্পষ্ট জবাব দেয় সৌমেন, মোটেও না। আমার তো মোটেই ভাল লাগে না। তাছাড়া কাদের পয়সায় এসব ফুটানি মারব?

এরপর নিজের পরিকল্পনার কথা জানায়, বুঝলে উর্মি, তুমি খুব সিম্পলভাবে আমাদের বাংলো সাজাবে। তাছাড়া সবাই যে ভাবে

সাজায় আমরা সে ভাবে সাজাব কেন? আমাদের বাংলোতে এসে সবাই যেন বুঝতে পারে আমাদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

সেদিনের কথা ভাবলে হাসি পায়। দুঃখ হয়। জনপথের এই বাংলোতে আসার পর আমাদের কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ল না কোথাও। সি. পি. ডবলিউ. ডি-র পুরনো ফাইলে মিনিষ্টার অফ ষ্টেটের জন্য যা যা লেখা ছিল, বরাদ্দ ছিল, ঠিক সেই মত ঘরদোর সাজান-গোছান হলো। তবুও সৌমেন সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের মত ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষমতা হারাল না।

নিউদিল্লীর হৃৎপিণ্ড হচ্ছে কনটপ্লেস আর জনপথ হচ্ছে মেরুদণ্ড। যেমন সেণ্ট্রাল এলাকা, তেমন সম্ভ্রান্ত পরিবেশ। এমন জায়গায় এত বিরাট জমির উপর মন্ত্রীদের বাংলো দেখে ওর কি রাগ। পৃথিবীর কোন শহরে একটা পরিবারের জন্য যে এতখানি জমি নষ্ট হয়, তা ও কল্পনা করতে পারত না। ও কথায় কথায় বলত, একি বাংলো? মোটেই না। এ হচ্ছে মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের তাঁবু; চার-দিকে শুধু মাঠ, মাঝখানে ক'খানি ঘর। ওর কথায় আমি হাসলেও কথাটা ঠিকই বলত। আমাদের বাংলোর মোট এরিয়া বোধহয় শ্যাম পার্ক বা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের চাইতেও বড় হবে। এই জমির উপর ফ্ল্যাট বাড়ী তৈরী করলে দু'এক শ' ফ্যামিলি থাকতে পারত। আমরা এই বাংলোর সামনে কতদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাইকেল শোভাযাত্রা দেখতাম। সকালে, বিকেলে। সারা দিনের পরিশ্রমের পর ওরা যেন সাইকেল চালাতে পারত না, কিন্তু তবু চালাতো। চালাতে হতো মাইলের পর মাইল।

'বল উর্মি, এই লোকগুলোর কোয়ার্টার যদি এখানে হতো, তাহলে কত ভাল হতো। আমরা যারা গাড়ী করে অফিস যাই তাদের বাড়ী দু'পাঁচ মাইল দূরে হলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো?'

তখন সৌমেন সত্যি সাধারণ মানুষকে ভালবাসত, তাদের কথা ভাবত। অনুভব করত ওদের দুঃখ, কষ্ট। প্রত্যেক মন্ত্রীর

বাংলোতেই একজন পি. এ.—পার্সোন্যাল এ্যাসিসট্যান্ট থাকেন। মোটামুটি নায়েবী করাই এর কাজ। আসেন সকাল সাড়ে সাতটায়-আটটায়। বাড়ী যান বারোটার পর। আবার আসেন তিনটে নাগাদ, বিদায় নেন রাত আটটার পর। কোন কোন দিন আরো পরে। এই রেসিডেন্স পি. এ. বাবুর বড় রকমের দায়িত্ব না থাকলেও নানা রকমের কর্তব্য পালন করতে হয়। নানা মানুষ নানা কারণে মন্ত্রীর বাংলোয় আসেন। কেউ আসেন সরকারী কাজে, কেউ আসেন রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার জন্য। কিছু কিছু মানুষ আসেন ভাগ্যের সন্ধানে, চাকরির খোঁজে। এছাড়াও আরো অনেকে আসেন; আসেন তৈল মর্দনের জন্য বা নিজের আভিজাত্য প্রচারের জন্য। বাংলোর পি. এ. বাবুকেই এদের সামলাতে হয়। এরপর আছে বাংলোর দেখাশুনা। জলের ট্যাঙ্ক লিক করছে? টয়লেটের সিসটার্ণ খারাপ? রান্নাঘরের দরজা-জানলার নেট পাল্টাতে হবে? কার্পেট নোংরা? বালব্ ফিউজ হয়েছে? পি. এ. বাবু সি. পি. ডবলিউ. ডি এনকোয়ারি অফিসে বলে সব ব্যবস্থা করে দেন। গোল মার্কেট থেকে মাছ আনতে হবে? পাহাড়গঞ্জ থেকে সরোলি আম? সস্তায় চাল-আটা? পিয়ন-বেয়ারা পাঠিয়ে ইনিই আনিয়ে দেবেন। মন্ত্রীর বাংলোয় বেগার খাটার লোক আরো থাকে। প্রত্যেক মন্ত্রীর বাংলোর পিছনে তিন-চারজন চাকর-বাকর থাকার কোয়ার্টার ছাড়াও ধোপার আস্তানা থাকে। ইংরেজ আমলে প্রত্যেক বড় সাহেবের নিজস্ব ধোপা থাকত। এখন মিনিষ্টার সাহেবদের নিজস্ব ধোপা না থাকলেও বাংলোয় ধোপার কোয়ার্টার আছে। সে কোয়ার্টারে কাপড় কাচার জায়গা, জল, কাপড় শুকোবার ব্যবস্থা সবকিছু আছে। এখন মন্ত্রীদের বাংলোতে যেসব ধোপা থাকে, তারা ব্যবসা করে যেখানে-সেখানে। বিনা পয়সায় কোয়ার্টার, জল-কল, ইলেকট্রিসিটি পাবার বিনিময়ে মন্ত্রীর বাড়ীর সবকিছু ফ্রি! সারভেণ্টস কোয়ার্টারে মন্ত্রীর চাকর-বাকর ছাড়াও

দু'চারজন অনুগ্রহপ্রার্থী থাকে। এরা সবাই বেগার খেটে মন্ত্রীর ঋণ শোধ করে। এদের সবার কমাণ্ডার-ইন-চীফ হচ্ছেন রেসিডেন্স পি. এ.। মন্ত্রীকে রেল-স্টেশন বা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার ও অভ্যর্থনা জানাবার দায়িত্ব এর। মন্ত্রীর বাংলোয় লাঞ্চ-ডিনার হলে একেই বাজার যেতে হয়, অতিথিদের পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, স্যার, দিস ইজ জাস্ট টু রিমাইণ্ড ইউ এ্যাবাউট টুমরোজ ডিনার....। অতিথিরা এলে তাদের গাড়ীর দরজা খুলে দেওয়া ও বিদায় বেলায় গাড়ীর দরজা বন্ধ করার দায়িত্বও এরই। এই ভদ্রলোককে আরো কত কি যে করতে হয়, তার ফর্দ করা মুশকিল। প্রায় অসম্ভব। তবে বোধহয় সব চাইতে বড় কাজ মন্ত্রীপত্নীর খিদমতগারী করা। ইনি মন্ত্রীর নিম্নতম পি. এ. হলেও মন্ত্রীপত্নীর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

আমি আস্তে আস্তে এসব জেনেছি। দেখেছি। আর জেনেছি রেসিডেন্স পি. এ-কে আলিপুর বা সফদারজঙ হাওয়া অফিসের মত আবহাওয়ার পূর্বাভাষ বলতে হয়। অফিস যাবার পথে প্রাইভেট সেক্রেটারী বাংলোয় এসেই একে কানে কানে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করবেন, মিনিষ্টারের মুড কেমন?

'ভাল।'

প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাখুশী। স্পেশ্যাল ইনক্রিমেণ্টের ফাইলটা তাহলে পুট আপ করা যাবে।

মুড খারাপ?

তাহলেই প্রাইভেট সেক্রেটারীর মুখ কালো হয়ে যাবে। অফিসের অন্যান্য পি. এ.-দের বলে দেবেন, আজ বি কেয়ারফুল! এইচ. এম.-এর মুড খুব খারাপ। মিনিষ্ট্রীর সেক্রেটারী, এ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারীদের পি. এ.-দের কাছেও পৌঁছে যাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ। 'হ্যালো রঙ্গস্বামী?'

'ইয়েস। ইয়েস! হাউ আর ইউ?'

'ভাল না ভাই। আজ মিনিষ্টারের মুড খুব খারাপ।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? কি ব্যাপার? ক্যালকাটা স্টেশনের রিপোর্ট পেয়ে খুব রেগে গিয়েছেন বুঝি ?'

'জানি না। আই উইল টেল ইউ লেটার।'

রিসিভার নামিয়েই আবার ডায়াল ঘোরাবেন।

'সচদেব ?...

'হ্যাঁ....

'আজ জয়েন্ট সেক্রেটারীকে একটু টিংকল দিও মন্ত্রীর মুড ভাল না।'

'নিশ্চয়ই বলব। তাহলে সি. বি. আই-এর ঐ ফাইলটা আজ পাঠাব না, কি বল ?'

'নট অ্যাট অল! তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

আমাদের বাংলোয় রেসিডেন্স পি. এ. হচ্ছে সত্যব্রত মুখার্জী। অভাবগ্রস্থ সাধারণ ইউ. ডি. সি. ছিলেন। কোটা হাউসে এসে আমাদের দুজনকেই নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানিয়ে পি. এ. হবার সকাতর অনুরোধ জানায়। পি. এ. হলে গোটা কতক টাকা বেশী মাইনে পাবে। আমরা দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে রাজী হই। সেই থেকে মুখার্জীবাবু আজো আছেন।

নতুন নতুন আমরা যখন এই বাংলোয় এলাম তখন ব্রেক-ফাষ্টের সময় সৌমেন প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করত, হ্যাঁগো, মুখার্জীবাবুকে কিছু খেতে দাও ?

'শুধু মুখার্জীবাবুকে না, বাবুরামকেও দিই।'

'রোজই দিও। হাজার হোক সাতটার মধ্যে বাড়ীর থেকে রওনা হন। নিশ্চয়ই এক কাপ চা ছাড়া আর খেয়ে আসেন না।'

আমি বলি, তাছাড়া সেই বিনয়নগর থেকে ওকে সাইকেল চালিয়ে আসতে হয়। কিছু খেলেও তো এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে

আবার ক্ষিদে পেয়ে যাবে।

'ঠিক বলেছ।'

আমাদের ব্রেকফাষ্ট খাবার সময় মুখার্জীবাবুকে নানা কারণে প্রায়ই সৌমেনের কাছে আসতে হতো। কাজের কথা হয়ে গেলেই সৌমেন বলত, বসুন, চা খান।

মন্ত্রী আর মন্ত্রীপত্নীর পাশে বসে চা খাবার কথা ভাবতে গিয়েই মুখার্জীবাবু যেন শিউরে উঠতেন, না, না, স্যার! আমি আর চা খাব না।

সৌমেন তবু বলতো, বসুন, বসুন, চা না খাবার কি হয়েছে? বাড়ীতে যখন ডিউটি দিচ্ছেন তখন বাড়ীর লোকের মতই থাকবেন।

মন্ত্রীর এই আন্তরিকতার জন্য মুখার্জীবাবু আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলতেন। 'স্যার, বাড়ীর লোকের মতই তো আপনারা রেখেছেন।'

মাঝে মাঝে অবসর মুহূর্তে সৌমেন মুখার্জীবাবু বা বাবুরামের বাড়ীর খোঁজখবর নিত, জানতে চাইত ওদের সুখ-দুঃখের কথা। একবার ও সন্ধ্যার প্লেনে কলকাতা থেকে ফিরছিল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক দেরীতে প্লেন যখন পালামে পৌঁছল তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। প্রতিবারের মত মুখার্জীবাবু, গানম্যান আর বাবুরাম এয়ারপোর্টে ছিল। সৌমেন গাড়ীতে উঠেই ওদের দুজনকে বললো, আপনাদের অনেক কষ্ট হলো। মুখার্জীবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না স্যার! এতে কষ্ট কি? সৌমেন বাংলোয় আসার পথে ওদের দুজনকে বিনয়নগর আর সেবানগরের কোয়ার্টারে নামিয়ে দিল। বাংলোয় পৌঁছে ড্রাইভার আর গানম্যানকে বললো, তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাও। কাল সকালে তাড়াহুড়ো করে আসতে হবে না।

সেসব দিনের কথা আমার সব মনে আছে। মন ভরে আছে। পূর্ণ হয়ে আছে। নতুন মন্ত্রী হবার পর অফিসে বসে সৌমেন কি করত আমি জানি না কিন্তু অফিসের বাইরে, বাংলোয়, রাস্তাঘাটে,

সর্বত্র সে মানুষকে সাহায্য করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। সাধারণ মানুষকে ভালবাসার নেশায় ও পাগল হয়ে উঠেছিল। আমার ভীষণ ভাল লাগত। মনে দারুণ আনন্দ হতো। গর্বও অনুভব করতাম। আমি দাদাকে চিঠি লিখে সবকিছু জানাতাম। আমার চাইতে দাদা অনেক অভিজ্ঞ, অনেক বিচক্ষণ। তাইতো উনি লিখেছিলেন, মানুষের কল্যাণ করার মত মহৎ কাজ এ জগতে নেই, কিন্তু সেই জন কল্যাণের পিছনে যদি কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ থাকে বা হঠাৎ কোন ভাবাবেগের জন্য এই শুভ বুদ্ধির উদয় হলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আশা করি ছোট-র এইসব কল্যাণকামী প্রবৃত্তির পিছনে কোন ভাবাবেগ বা ক্ষুদ্রতা নেই। আপন মনের আনন্দেই সে মানুষকে সুখী করতে চায়।

যখন দাদা এই চিঠি লিখেছিলেন তখন বোধহয় আমিও ভাবাবেগের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলাম। স্বামীর ঔদার্যে, কৃতিত্বে আমি তখন মুগ্ধ। মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না। ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েও ও এত সাধারণ থাকত যে মুগ্ধ না হয়ে কেউই পারত না। দাদার অফিস ছিল, অশোক-মানুর স্কুল ছিল, দিদির সংসার ছিল; তবু যে যখন সময় পেত, দিল্লী আসত। অশোক-মানু এলে মাও আসতেন। প্রত্যেকবার ওদের আনতে বা তুলে দেবার সময় সৌমেন স্টেশন যেত, নিজে হাতে মালপত্র নামাত-ওঠাত। দাদা কতবার বলেছেন, কি করছিস ছোট? তুই মিনিষ্টার হয়ে মাল টানাটানি করছিস দেখলে লোকে কি ভাববে বলতো?

সৌমেন রেগে যেত, তুমি আমাকে এসব কথা বলবে না তো। তুমি কখনো আমাকে মিনিষ্টার-টিনিষ্টার বলবে না।

শুধু মন্ত্রী হিসেবে নয়, স্বামী হিসেবেও সৌমেন কত সহজ, সরল, মনের মানুষ ছিল তখন। প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় আমরা বেড়াতে যেতাম। হেঁটে-হেঁটে, গল্প করতে করতে। রাস্তায় ধারে কাছে কোন লোকজন না থাকলেই ও আমার হাত ধরত। কখনও

কখনও বা কোমরটাই জড়িয়ে ধরত। 'মনে আছে উর্মি, কবে প্রথম তোমার কোমর জড়িয়ে ধরি ?'

আমি ঠোঁট চেপে হাসি লুকিয়ে জবাব দিলাম, না।

'না ?' ও অবাক হয়।

'প্রথম দিন সেই তর্কাতর্কি হবার পর এমন স্পীডে তুমি এগিয়ে এলে যে........

'আমি এগিয়ে ছিলাম নাকি তুমি এগিয়েছিলে ?'

'বোধহয় দুজনেই।'

সৌমেন খুশী হয়, ঠিক বলেছ। তারপর একটু থেমে বলে, প্রথম এক সঙ্গে সিনেমা দেখার কথা মনে আছে ?

'আছে।'

'বলতো কোথায় দেখেছিলাম ?'

'পূরবীতে।'

'হ্যাঁ। ঐ পূরবীতে সিনেমা দেখে বেরুবার সময়ই প্রথম তোমার এই কোমর জড়িয়ে ধরি।' ও মিট মিট করে হাসতে হাসতে বললো।

'তাই বুঝি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ইচ্ছা হয়েছিল অনেক আগেই, কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। তাছাড়া ঠিক সুযোগও আসে নি।'

মন্ত্রী হলেও বয়সটা তো বেশী হয় নি তখন। আমাকে নিয়ে তখনও ওর অনেক স্বপ্ন, অনেক নেশা। দূরের উদাস দৃষ্টি গুটিয়ে কেমন যেন মিষ্টি স্বপ্নালু দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। 'একটা ইচ্ছা আমার আজো পূর্ণ হলো না......

আমি চমকে উঠলাম। ভাবলাম ছেলেমেয়ে হবার কথা বলছে না তো ? ও মন্ত্রী হবার পর পরই যদি আমাকে মেটারনিটি ওয়ার্ডে ভর্তি হতে হয়, তাহলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। সবাই ভাববে মন্ত্রী হবার আনন্দেই...

ও আবার বলতে শুরু করল, নতুন নতুন বিয়ে হবার পর আমি অনেক দিন রাত্রে তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতাম।

আমি বলি, তা তো দেখবেই। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরও তো তুমি অনেক দিন জেগে থাকতে।

'শুধু তখন নয় উর্মি, মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও আমি চুপ করে তোমাকে দেখতাম।'

'কেন?'

'দেখতে ভাল লাগত, খুব ভাল লাগত। আর কত কি যে ভাবতাম সে তোমাকে বলতে পারব না।'

'কি আবার ভাবতে?'

'ভাবতাম তোমার ভালবাসা আর তোমার দেহটার কথা।'

শুনতে আমার ভালই লাগত। কিন্তু মুখে বলতাম, বন্ধ করো তো তোমার অসভ্যতা।

ও চুপ করত না। 'সত্যি উর্মি, তখন থেকে একটা স্বপ্ন মনের মধ্যে আজো জমে রয়েছে...।

'কি স্বপ্ন?'

'উদয়পুর পিচোলা লেকের পাড়ে, পাহাড়ের উপরের গেষ্ট হাউসে একবার দুজনে মিলে ক'টা দিন কাটাব আর প্রাণ ভরে তোমাকে, তোমার এই দেহটাকে দেখব।'

আমি ওকে একটু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বললাম, রাখো তো তোমার ছেলেমানুষী!

কয়েক মাস পরে সত্যি সত্যিই আমরা উদয়পুর গিয়েছিলাম। পিচোলা লেকের ধারে, পাহাড়ের উপরের গেষ্ট হাউসে পুরো দুটো দিন কাটিয়েছিলাম। প্রায় স্বপ্নের মত কেটেছিল ঐ দুটো অবিস্মরণীয় দিন। এই পৃথিবীতে বাস করেও আমরা যেন আনন্দের অমরাবতীতে চলে গিয়েছিলাম। বিন্দু দিয়েই সিন্ধু। টুকরো টুকরো অসংখ্য মুহূর্তের মালা দিয়েই তো জীবন। কিন্তু আমরা

উপভোগ করি কি প্রতিটি মুহূর্ত? আর কোনদিন না হোক ঐ দুটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলাম, উপভোগ করেছিলাম। সৌমেনকে ভালবেসে যে অন্যায় করিনি, ভুল করি নি, সেটা ঐ দু'দিন আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

পায়ের নীচের মাটিতে কত বীজ অঙ্কুরিত হয়। একদিন তারাই আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। আবার আকাশ চুম্বী হিমালয়ের কোলে জন্ম নেয় কত নদী। কিন্তু হিমালয় বাসের মেয়াদ কতক্ষণ? সব নদীকেই নেমে আসতে হয় সমতল ভূমিতে, বিলীন হতে হয় সমুদ্র গর্ভে। আমার মনের মানুষ, প্রাণের পুরুষ, যৌবনের স্বপ্ন, আদর্শ সৌমেনও নেমে এলো; মিশে গেল, হারিয়ে গেল মন্ত্রীত্বের জোয়ারে।

পাঁচ

শৈশবে মানুষ মুগ্ধ হয়ে নতুন পৃথিবী দেখে। কৈশোরে সে চঞ্চল হয়ে ছোটাছুটি করে; যৌবনে মানুষ মাটির পৃথিবীতে বাস করেও স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে। প্রৌঢ় কর্তব্যের জালে বন্দী। বার্দ্ধক্যে হিসাব-নিকাশ। সারা জীবনের সব কিছু স্মৃতির রোমন্থন। এটাই নিয়ম, স্বাভাবিক। অতীত জীবনের স্মৃতি, ফেলে আসা দিনগুলোর কথা রোমন্থন করার মত প্রবীণা আমি হই নি। এখনও অনেক দেরী। আমি প্রৌঢ়া। একটু সাজগোজ করলে অনেকে যুবতী ভাবে। সকালবেলার দিকে সানগ্লাস চোখে দিয়ে জনপথের দোকানগুলোতে গেলে অনেক লোক লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখে। অনেক সময় ছোটখাট সরস মন্তব্যও আমার কানে আসে। আমি অপরূপা না হলেও সুন্দরী। আমি বরাবরই সিনেমা দেখতে ভালবাসি। বিশেষ করে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় একটু তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ হলেই আমি কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিয়ে কোন না কোন সিনেমা হলে ঢুকে পড়তাম। পরবর্তীকালে সৌমেনকে সিনেমায় যাবার কথা বললেই ও একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাত। তারপর আমার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে একবার দৃষ্টি

বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করত, কি বলছে ?

'বলছি, চল সিনেমায় যাই।' আমি বলতাম।

প্রায় উন্মাদের মত অর্থহীন হাসি হাসত সৌমেন। আমি জিজ্ঞাসা করতাম, হাসছ কেন ?

'হাসব না? তোমার পাশে বসে ঐ ন্যাকা ন্যাকা কুচ্ছিত হিরোইন দেখব?' আবার একটু হাসি, তাও পয়সা খরচ করে ?

হয়ত আমাকে খুশী করার জন্য ও আমার ফ্লাটারী করত। ঠিক জানি না। হয়ত বা একটু বাড়াবাড়িই করত। আমাদের ক্লাসের শেখর চ্যাটার্জী কফি হাউসে বা ওয়াই.এম.সি.এ-তে আড্ডা দেবার সময় অন্যান্য অনেকের সামনেই বহু দিন বলেছে, উর্মিলা, তোমাকে দেখলেই প্রেম করতে ইচ্ছে করে।

আমি হাসতে হাসতে বলতাম, করো, কিন্তু প্রতিদানে কিছু আশা করো না।

শেখরও হাসত। বলতো, আমার যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে তোমাকে নিয়ে যে কত কবিতা লিখতাম তা তুমি ভাবতে পারবে না।

'যদি কফি হাউসের বিল পেমেণ্ট করো আর রেগুলার সিনেমা দেখাও তাহলে শুধু দূর থেকে প্রেম করা নয়, কবিতা লেখার অনুমতিও দিতে পারি।'

পরে, যখন আমি সৌমেনের কাছে বন্দিনী হলাম তখন শেখর ওকে বলতো, সৌমেন, তুই উর্মিলাকে বিয়ে কর, এক বিছানায় দু'জনে লুটোপুটি খা, ফ্রয়েড সাহেবের ল্যাবরেটরী এ্যাসিসট্যাণ্ট হও, কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমাকে পার্ট টাইম প্রেম করার পারমিশন দিস।

সেই আমি নেই, কিন্তু সেদিনের সব মাধুর্য এখনও হারিয়ে যায় নি। এইতো গত বছর দুর্গা পূজার সময় কালীবাড়ীতে ইন্দ্রানীর সঙ্গে দেখা। ইন্দ্রানী দিল্লীতেই আছে। ওর স্বামী সি.পি.ডবলিউ.ডি-র

এঞ্জিনিয়ার। ফুটফুটে সুন্দর দুটো ছেলে, কিন্তু ওর নিজের স্বাস্থ্যটা একেবারে গেছে। আগের মত রং ফর্সা নেই, ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। কালীবাড়ীর ভীড়ের মধ্যেই আমাকে দেখতে পেয়ে জড়িয়ে ধরল। আমি কিছু বলার আগেই বললো, বাপরে বাপ! তোকে কি দারুণ দেখতে লাগছে রে!

আমি এক সঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলাম; কোথায় আছিস, কেমন আছিস, বর কি করছে, কটি বাচ্চা, শেখর, মধুমিতা বা অন্য কারুর খবর জানিস কিনা।

'সব বলছি, কিন্তু আগে বল তুই আর কত সুন্দর হবি?'

ইন্দ্রানী নিজের রূপ খুইয়েছে বলে হয়ত আমাকে বেশী সুন্দরী মনে করেছে। কিন্তু রূপ থাকলেই তো চোখে যৌবনের স্বপ্ন থাকে না। আমারও নেই। তাইতো একটু একা হলেই, একটু ফাঁকা পেলেই বৃদ্ধাদের মত অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করি।

আমি প্রতিবাদ করি না, ঝগড়া করি না, কিন্তু সৌমেনের এই বিবর্তন আমি স্বীকার করে নিতে পারি না। আমার দুঃখ হয়, আমার কষ্ট হয়। সৌমেনকে আমি ভালবাসি, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ওর মত আমিও এম.এ পাশ করেছি কিন্তু আমি জানি ও আমার চাইতে অনেক বেশী বুদ্ধিমান, মেধাবী। আমার রূপ আছে, গুণ আছে কিন্তু ও প্রতিভাবান। আমি ভাল, কিন্তু ও মহৎ। তাইতো যখন দেখি ওর সেই মহত্ব, সেই প্রভিতা রাজনীতির চোরাগলিতে বিচরণ করতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, মন্ত্রিত্বের অহমিকায় মহত্ব পরাজিত হচ্ছে, প্রতিভার অপব্যবহার হচ্ছে, তখন বড় কষ্ট হয়। বড় বেদনা বোধ করি মনে মনে। আমি ভাবতে পারি না, কল্পনা করতে পারি না, মিঃ ভীমাপ্পার মা মারা যাবার আগে একবার ও দেখা করার সময় পেল না। ইচ্ছা হলো না।

এই দিল্লীতে আসার পর মিঃ ভীমাপ্পাই সৌমেনের প্রথম বন্ধু। আমার বেশ মনে আছে। সেদিন রাজ্যসভায় ওর প্রশ্নোত্তরের

প্রথম দিন। আমি উপরের গ্যালারীতে বসে আছি। প্রথম দুটো তিনটে প্রশ্নের উত্তর বেশ ভালই দিল, কিন্তু তারপর একটা প্রশ্নের সাপ্লিমেণ্টারীর উত্তরে অনেক মেম্বার ঠিক খুশী হলেন না। একজন প্রবীণ সদস্য উপহাস করে মন্তব্য করলেন, টু ইয়াং এ প্রফেসার টু স্যাটিসফাই দি সিনিয়র ষ্টুডেণ্টস অফ রাজ্যসভা। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ভীমাপ্পা উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললেন, মিঃ চেয়ারম্যান স্যার! নতুন তরুণ মন্ত্রী সম্পর্কে আমার বন্ধুর মন্তব্যটি ঠিক হলো না। হি সুড নো ছাট বয় ইজ এ গুড এ্যাণ্ড ট্যালেনটেড আর্টিষ্ট, বাট নিউ টু দি ষ্টুডিওজ অফ অল ইণ্ডিয়া রেডিও!

উপরাষ্ট্রপতি ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হাসতে হাসতে সৌমেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়েস মিঃ ইয়াং ব্রাইট নিউ মিনিষ্টার, উড ইউ লাইক টু থ্যাঙ্ক ব্রিলিয়াণ্ট এ্যাডভোকেট মেম্বার মিঃ ভীমাপ্পা ফর ডিফেণ্ডিং ইউ উইদাউট চার্জিং হিজ ফোর-ফিগার ফিজ?

সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। ঐ হাসির মধ্যেই সৌমেন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, স্যার! আই ওনলি থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর জেনরোসিটি টু মী এ্যাণ্ড কমপ্লিমেণ্টস টু মিঃ ভীমাপ্পা।

আবার হাসি।

একজন অপোজিশন মেম্বার বললেন, স্যার, মিনিষ্টার আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার নামে নিজেকে ও মিঃ ভীমাপ্পাকেও ধন্যবাদ জানালেন। এটা কি ঠিক হলো স্যার?

চেয়ারম্যান গাম্ভীর্যের ভান করে বললেন, নো মোর থ্যাঙ্কিং থ্যাঙ্কলেস পলিটিসিয়ানস্। নেক্সট্ কোশ্চেন।....

আবার হাসি।

সেই সেদিনই সৌমেন আর ভীমাপ্পা হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে এলো রাজ্যসভা থেকে। আমি গ্যালারী থেকে নেমে পার্লামেণ্ট হাউসের মেন গেটের কাছে আসতেই ওদের সঙ্গে দেখা। সৌমেন

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, মিঃ ভীমাপ্পা, ইনি আমার স্ত্রী ঊর্মিলা।

নমস্কার বিনিময় করলাম আমরা তু'জনে। এর পরই সৌমেন বললো, জানেন মিঃ ভীমাপ্পা, আমরা তু'জনে একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম।

ভীমাপ্পা আনন্দে ফেটে পড়লেন, দেন উই মাষ্ট সেলিব্রেট!

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তু'জনকে নিয়ে গেলেন ওর বাড়ীতে। হাসি মুখে হাত জোড় করে ওর স্ত্রী আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আর মা? তু'হাত দিয়ে সৌমেনের মাথাটা টেনে নিয়ে কপালে চুমু খেলেন। তারপর আমাকেও। আমরা তু'জনেই ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

আমি বললাম, কোন খোঁজ-খবর না দিয়েই আপনাদের বিরক্ত করতে এলাম।

'ছেলেমেয়েরা এলে মা বিরক্ত হতে পারে?'

সৌমেন বললো, ঠিক আছে। এবার থেকে এমন বিরক্ত করব যে আপনি পাগল হয়ে যাবেন।

পাশে দাঁড়িয়ে মিসেস ভীমাপ্পা বললেন, চেষ্টা করে দেখবেন।

মিঃ ভীমাপ্পার মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বাড়ীর মধ্যে এগুতে এগুতে বললেন, তোমরা অনেক লেখাপড়া জান, তে[illegible]রা বুদ্ধিমান, তোমরা গুণী। কিন্তু বাবা, শুধু ভালবাসার জোরেই আমরা সব সন্তানকে হারিয়ে দিই।

সত্যি, এই পৃথিবীর সব সশস্ত্র মানুষকে হারিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু যাঁদের হাতে কোন অস্ত্র নেই, যাঁরা শুধু স্নেহ-ভালবাসা সম্বল করে এগিয়ে আসেন, যাঁরা শুধু কল্যাণ কামনা করেন, তাঁদের কে হারিয়ে দেবে? কেউ না। তাইতো স্নেহাতুর মায়ের কাছে সব সন্তানকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। ভীমাপ্পা-জননীর কাছেও আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। ভালবাসলাম মিঃ ভীমাপ্পাকে, ভালবাসলাম তাঁর স্ত্রী

অনুরাধাকে। কৃষ্ণা-কাবেরী-গঙ্গা-গোদাবরী যেন এক হয়ে মিশে গেল।

'হ্যালো!'

'দাদা, আমি অনুরাধা বলছি।'

'বল কি খবর?'

'আমার বাবার শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছে........'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ দাদা, আজ সকালেই আমার ছোট ভাই টেলিফোন করেছিল........

'ভীমাপ্পা গত সপ্তাহে বললো যে ভালই আছেন......'

'ভালই ছিলেন। কিন্তু পরশু দিন থেকে শরীরটা আবার হঠাৎ খারাপ হয়েছে.......

'তুমি হায়দ্রাবাদ যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ দাদা, আজই জি. টি. এক্সপ্রেসে আমরা যাচ্ছি। তাই বলছিলাম ঊর্মিলা যদি মাকে ক'দিনের জন্য নিয়ে যায় তাহলে...

শুধু ভীমাপ্পার মা নয়, অনুরাধাও আমাদের কাছে থাকত দরকার হলে। সৌমেন না থাকলে আমিও ওদের ওখানে গেছি। যাওয়া-আসা খাওয়া-দাওয়া তো হরদমই ছিল। কিন্তু অবাক হয়েছিলাম সৌমেনের জন্ম দিনে। কানাড়া ব্রাহ্মণকে দিয়ে পূজা করিয়ে মা নির্মাল্য দিয়েছিলেন সৌমেনের মাথায়, নিজে হাতে ওকে পরমান্ন খাইয়েছিলেন আর উপহার দিয়েছিলেন ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি।

কোন না কোন স্বার্থের তাগিদেই মন্ত্রীদের চার পাশে কিছু মৌমাছি ভন ভন করে কিন্তু সবাই কি? না, কখনই নয়। স্বার্থ-পরের নিত্য কুম্ভমেলা চলছে এই দিল্লী শহরে। কিন্তু এখানেও, এই অন্ধকার অরণ্যেও কিছু মানুষ আছে যারা শুধু দিতে চায় মনের ঐশ্বর্য, প্রাণের সৌরভ। দিতে চাইলেই কি সে ঐশ্বর্য সবাই গ্রহণ করতে পারে?

এইখানেই আমার দুঃখ, এইখানেই আমার বেদনা। অর্থ, সামর্থ, প্রচেষ্টা দিয়ে হয়ত মানুষ অনেক কিছুই অর্জন করতে পারে। কিন্তু প্রেম? ভালবাসা? স্নেহ? পুত্রস্নেহ? মায়ের প্রাণভরা শুভ কামনা?

মিঃ ভীমাপ্পা মহীশূরের একজন যশস্বী আইনজীবি। কংগ্রেসের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য অর্থ দিয়ে, সামর্থ দিয়ে অনেক বছর ধরে অনেক কিছু করেছেন বলেই রাজ্যসভায় এসেছেন। আনা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টেও ভাল প্রাকটিশ। তাছাড়া প্রায়ই কলকাতা-বোম্বে-মাদ্রাজ-এলাহাবাদ হাইকোর্টে যেতে হয়। ওর বাবাও নাম করা উকিল ছিলেন। বিরাট বিষয়-সম্পত্তি করেছেন মহীশূরে। উনি ওখানেই আছেন। দিল্লীতে এলেই শরীর খারাপ হয় বলে আসেন না। মিঃ ভীমাপ্পার ছোট ভাই ডাক্তার। ওদের কাছেই মিঃ ভীমাপ্পার মেয়ে থাকে। ও আবার দাদুর ভীষণ ভক্ত। তাছাড়া বাবার চাইতে কাকাকেই অনুসূয়া বেশী পছন্দ করে। আমরা দু'জনে ওদের বাড়ী গেছি, থেকেছি। এক কথায় চমৎকার পরিবার। মিঃ ভীমাপ্পা অন্য সব শহরে গিয়ে বড় বড় হোটেলে থাকেন, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে আমাদের ঐ রাজবল্লভ পাড়ার বাড়ীতেই উঠবেন। সব সময়। দাদাকে উনি ভীষণ ভক্তি করেন, ভালবাসেন। মা, দিদি, অশোক-মানুর সঙ্গেও খুব ভাব। উনি ডাঃ সৌমেনকে বলেন, আমাদের বড় বাড়ী ক্ষেত-খামার আছে। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা-কড়িও আছে, কিন্তু তোমার চাইতে ধনী আমরা না।

প্রথমে ও ঠিক বুঝতে পারে নি। একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, তার মানে?

'অমন দাদা-বৌদি আর মা থাকতে আর কি চাই ভাই?'

সৌমেন কিছু বলার আগেই আমি বললাম, ঠিক বলেছেন দাদা! ঐ দাদাই আমার এ বাড়ীর সব চাইতে বড় আকর্ষণ।

সৌমেন বললো, দাদা ইজ গ্রেট!

মিঃ ভীমাপ্পা বললেন, আমি ওকে গ্রেট বলব না, বলব কমপ্লিট ম্যান। একটা পরিপূর্ণ, সুন্দর মানুষ।

উনি কলকাতা থেকে ঘুরে এলে দিনের পর দিন ধরে কলকাতার বাসার আলোচনা চলত। 'জানতো উর্মিলা, আমি এখন তোমাদের ঘরে শুই।'

সৌমেন বলে, আর কোন্ ঘরে তোমাকে শুতে দেবে ?

'দেখছ উর্মিলা, মন্ত্রীরা কেমন ইমপেসাণ্ট হয় ? পুরো কথাটা না শুনেই লেকচার দিতে শুরু করে।'

আমরা হাসি।

উনি এবার বলেন, আমি তোমাদের উপরের ঘরে শুই। কিন্তু তোমার দাদা-বৌদিও প্রায় সারা রাত উপরের ঘরেই কাটান।

সৌমেন আর আমি প্রায় এক সঙ্গে প্রশ্ন করি, অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হয় বুঝি ?

'লাষ্ট স্যাটারডে আমি আর তোমার দাদা তো সাড়ে তিনটে পর্যন্ত গল্প করেছি।'

সৌমেন বললো, রিয়েলি ?

'তবে কি ? তোমার দাদা যে কি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন না, তাই আমি-ভাবি। ইন ফ্যাক্ট তোমার দাদার মত লোক পার্লামেণ্টে বিশেষ নেই বললেই চলে।'

দাদা সত্যি খুব পড়াশুনা করেন। পড়াশুনায় বরাবরই ওর আগ্রহ। কিন্তু আগে বিশেষ সময় বা সুযোগ পান নি। সৌমেন চাকরি নেবার পরই উনি বেশ জোর দিয়ে পড়াশুনা করছেন। আমি ঐ সামান্য পার্ট-টাইম লেকচারার হবার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেলে দাদা আমাদের দু'জনকে ডেকে বললেন, তোমরা দুজনেই এখন রোজগার করবে, সুতরাং এবার থেকে মাসে মাসে আমাকে কিছু দিতে হবে।

আমি বললাম, কিছু কেন, সবটাই আপনি পাবেন।

'না, না, তা আমি নেব কেন?'

সৌমেন বললো, যা দরকার মার কাছ থেকে নিয়ে নিও। একথা আবার বলার কি আছে?

দাদা হেসে বললেন, তুই মাইনে এনে মাকে দিস বলে কি মার কাছে টাকাকড়ি থাকে?

সংসারের টাকাকড়ি দিদিই ম্যানেজ করতেন। তাই দাদার কথায় আমরা হাসলাম।

শেষে দাদা বললেন, সংসারের জন্য তো তোমরা দিচ্ছ এবং দেবে। কিন্তু এবার থেকে তোমাদের ইনকামের ফাইভ পার্সেণ্ট দিয়ে আমাকে বই কিনে দেবে।

সৌমেন মন্ত্রী হবার পর প্রথম মাসের মাইনে পেলে ফাইভ পার্সেণ্ট দিয়ে বই কিনে কলকাতা পাঠান হয়। অত টাকার বই পাবার পর দাদা সঙ্গে সঙ্গে আইন বদলে দিলেন, এবার থেকে কোন মাসেই কুড়ি টাকার বেশী বই পাঠাবে না। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি—নানা ধরণের বই দাদাকে পাঠান হয়। এছাড়া পার্লামেণ্টের প্রসিডিংস থেকে শুরু করে সব রকম কমিটির রিপোর্ট প্রত্যেক মাসে বাণ্ডিল বেঁধে কলকাতা পাঠান হয়। আগে অন্যান্য মন্ত্রীদের মত এসব আমাদের গুদাম ঘরে জমা হতো। অথবা বাইরের অফিস ঘরে। শেষে একদিন পি. এ. বাবু পুরনো কাগজওয়ালা ডেকে বেচে দিতেন।

দাদা দিল্লীতে খুব কম আসেন। এলে যতক্ষণ বাড়ীতে থাকবেন ততক্ষণ এইসব সরকারী বইপত্তর পড়বেন অথবা আমার সঙ্গে গল্প করবেন। মন্ত্রী বা এম. পি-দের সঙ্গে দাদা বিশেষ মিশতে চান না। শুধু দ্বারভাঙ্গার মিশ্রজী আর ভীমাপ্পা সাহেবের সঙ্গে দাদার খুব ভাব। যখন তখন হাঁটতে হাঁটতে ভীমাপ্পা সাহেবের অশোক রোডের বাংলোয় চলে যান। ভীমাপ্পা থাকলে ভাল, না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। অনুরাধা আর মার সঙ্গে গল্প করেন। ফিরে

এসে কোন দিন বলেন, উর্মিলা তুমি তো অনুরাধাকে বেশ বাংলা শিখিয়েছ।

'কেন ও বুঝি বাংলায় কথা বললো?'

'হ্যাঁ। টুক টুক করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বেশ কথা বললো।'

কোন দিন আবার বলেন, মিঃ ভীমাপ্পার মা পূজার ঘরে গিয়ে কানাড়া রামায়ণ পাঠ করেন, শুনেছ কোনদিন?

'হ্যাঁ দাদা শুনেছি।'

'হঠাৎ শুনলে মনে হয় ভজন গাইছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ দাদা, ঠিক ভজনই মনে হয়।'

আমি আর দাদা ভিতরের ঘরে পায়চারি করতে করতে কথা বলি!

'জান উর্মিলা, অফিসিয়াল সিটির কতকগুলো ইনহেরেণ্ট ত্রুটি থাকে। দিল্লীরও আছে। আমি বিদেশে কোথাও যাই নি কিন্তু পড়াশুনা করে বুঝেছি লণ্ডন-প্যারিস-টোকিও বা রোম সব দেশে সম্ভব নয়। দিল্লী কোনদিন মস্কো বা কায়রো হবে বলেও মনে হয় না......

আমি দাদার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে কথা শুনি।

'তাইতো দিল্লী সম্পর্কে আমার অনেক রিজার্ভেশন। কিন্তু এই মিশ্রজী আর ভীমাপ্পা ফ্যামিলিকে পেয়ে মন ভরে যায়।'

অশোক-মানুর ছুটি হলে মা ওদের নিয়ে আমাদের কাছে আসেন। ভীমাপ্পা সাহেবের মাকে আর অনুরাধাকে মারও খুব ভাল লাগে। মা আগে একেবারেই হিন্দী বলতে পারতেন না বলে কথাবার্তা বলতে অসুবিধা হতো। গরমের ছুটিতে পুরো দেড় মাস দিল্লীতে কাটিয়েই মা কাজ চলার মত হিন্দী শিখে নেন। মিশ্রজী দ্বারভাঙ্গার লোক। চমৎকার বাংলা জানেন।

এই দুটি পরিবারের কাছে কি পাই নি? অথচ এখন সব হারাতে বসেছি। গত ইলেকশনের পর সৌমেনের উন্নতি হলো।

ইনফরমেশন ব্রডকাষ্টিং থেকে এলো এডুকেশনে। কতকগুলো ন্যাশনাল ল্যাবরেটরীতে নানা রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে রাজ্যসভায় বিতর্ক হচ্ছিল। মিঃ ভীমাপ্পাও ল্যাবরেটরীগুলোর পরিচালকদের তীব্র সমালোচনা করেন। ভীমাপ্পা এই রকম সমালোচনা করায় সৌমেন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলো। পার্লামেণ্ট থেকে ফিরে চা খেতে খেতে ও আমাকে বললো, ভীমাপ্পা পাল্টে গেছে।

ওর কথা শুনে আমি অবাক, তার মানে?

'আজ ইনডাইরেক্টলি আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বললো।'

আমি আরো অবাক হই, তোমার বিরুদ্ধে?

'ন্যাশনাল ল্যাবরেটরীগুলোর অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের বিরুদ্ধে বলা মানেই আমার বিরুদ্ধে বলা।'

আমি সৌমেনকে বোঝাই, তা কেন হবে? ন্যাশনাল ল্যাবরেটরী-গুলোর এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে যে অনেক ত্রুটি আছে, তা তো তুমিও বলো।

ও ঠোঁটটা কামড়ে মাথা দোলাতে দোলাতে বললো, পলিটিক্স ইজ নট এ ক্লীন গেম, উর্মি!

এমনই যোগাযোগ ঠিক সেইদিন রাত্রিতে মিঃ ভীমাপ্পা এসে হাজির। আমি জানতাম সৌমেন ওর উপর রেগে আছে। তাই আমিও কাছে কাছেই থাকলাম। কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর রাজ্যসভার ডিবেট নিয়েই আলোচনা শুরু হলো। মিঃ ভীমাপ্পা বললেন, ঐ গোটা কতক অফিসারকে ঠাণ্ডা না করলে তুমি কিছুতেই সাকসেসফুল হবে না। মনে হয় আজকের ডিবেটের পর ইউ হ্যাভ বিকাম পাওয়ারফুল। এবার ওদের ঠাণ্ডা করো তো।

সৌমেন খুব গম্ভীর হয়ে বললো, কিন্তু ভীমাপ্পা, আমার তো ঠিক উল্টোটাই মনে হচ্ছে......

'নট এ্যাট অল সৌমেন।'

'না ভীমাপ্পা, আমি ঠিকই বলছি। তুমি আজ আমাকে

একেবারে পথে বসিয়েছ।'

'তোমার কি মাথা খারাপ সৌমেন? আমি তোমাকে পথে বসাব?'

'একটা সত্যি কথা বলবে?'

মিঃ ভীমাপ্পা বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, নিশ্চয়ই বলব।

'কে তোমাকে ব্রীফ করেছে? মিঃ পাণ্ডে না কিদোয়াই?'

'তোমার বিরুদ্ধে আমাকে ওরা ব্রীফ করবে? এত সাহস ওদের আছে?'

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথার শেষে মিঃ ভীমাপ্পা বললেন, অপারেশন থিয়েটারে সার্জেন্ট ছুরি চালায় খুন করার জন্য নয়, রোগমুক্তির জন্য। তুমি যদি সার্জেনকে খুনী বল তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

সৌমেন চুপ করে বসে রইল। কোন কথা বললো না। মিঃ ভীমাপ্পা হঠাৎ এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হলো উর্মিলা, তুমিও কি আমাকে এনিমি ক্যাম্পের লোক মনে করতে শুরু করলে?

'কি যা তা বলছেন দাদা?'

'এত রাত হলো অথচ খেয়ে যেতে বলছ না!'

আমরা তিনজনে একসঙ্গে খেলাম। খাবার টেবিলে হাসি-ঠাট্টাও হলো। কিন্তু সৌমেনের মন থেকে সন্দেহের মেঘ একেবারে বিদায় নিল না।

সন্দেহ!

এই সন্দেহ করা আমি ভীষণ ঘেন্না করি। সোজাসুজি চোর-ডাকাত-খুনী বললে কোর্ট-কাছারিতে বিচার হয়, সাক্ষীসাবুদ আসে, উকিলবাবুরা দিনের পর দিন তর্ক করেন। তারপর তাকে মুক্তি বা শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সন্দেহ? প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই, শুধু মনে মনে ধারণা করে নিলেই হলো।

মন্ত্রী পত্নী হয়ে এই এতকাল দিল্লীতে বাস করে একটা বিচিত্র উপলব্ধি হয়েছে—এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, ভালবাসে না। এখানে প্রকাশ্যে ঝগড়া-তর্ক বিশেষ হয় না, মুখের উপর কেউ কারুর নিন্দা করে না, করার সাহস নেই, মনের জোর নেই। বেশী দিন রাজনীতি করলে বোধহয় মেরুদণ্ড সোজা থাকে না। ভেঙ্গে যায়। তাই এখানে প্রকাশ্যে, আলোয় ভরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ কিছুই হয় না, বড় বড় নাম করা অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও সেখানে মৃত সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এখানে বড় বড় নাটক অভিনীত হয় রঙ্গমঞ্চের পিছনে, অন্ধকারে।

আমি ইতিহাসের ছাত্রী না। স্যার যদুনাথ সরকারের মোটা মোটা বইগুলো আমি পড়ি নি। কিন্তু তবু যা পড়েছি জেনেছি, তাতে এইটুকু স্থির বিশ্বাস হয়েছে দিল্লী শুধু ভারতের রাজধানী নয়, রাজনৈতিক চক্রান্তের পীঠস্থান। এই দিল্লীই তো পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। মহাভারতের পাতায় পাতায় জঘন্যতম রাজনৈতিক-পারিবারিক চক্রান্তের ইতিহাস লেখা আছে। তারপর এসেছে রাজপুত, এসেছে তুর্কী, রাজত্ব করেছে দাস বংশ, তুঘলকরা, খিলজিরা। গিয়েছে মোগল, এসেছে ইংরেজ। কেউ শান্তিতে রাজত্ব করতে পারে নি। চক্রান্ত আর ব্যভিচারে সব সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে। আজও যারা গদীতে, যারা সৌমেনের মত মন্ত্রীত্ব করছেন, তারাও চক্রান্তের বিভীষিকায় শান্তিতে ঘুমোতে পারে না, প্রাণ খুলে হাসতে পারে না।

আমি রাজনীতি বুঝি না, বুঝতে চাই না। রাজনীতি বুঝলেই মানুষকে অবিশ্বাস করতে হবে, প্রাণ খোলা হাসিকে মনে করতে হবে উপহাস, বন্ধু-জনোচিত সমালোচনাকে মনে করতে হবে বিদ্রোহ ঘোষণা।

পারি নি। পারব না।

আস্তে আস্তে এমন দিন এলো যখন সৌমেন বললো, হাজার হোক একজন অর্ডিনারী এম. পি-কে অতটা কাছে আসতে দেওয়া

ঠিক হয় নি।

আমি তর্ক করলাম না, প্রতিবাদ করলাম না। কেন তর্ক করব? প্রতিবাদ করব? অন্য মানুষকে যে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধা করে না অন্যের মতবাদকে, তার সঙ্গে তর্ক করব কেন? প্রতিবাদ করতাম, তর্ক করতাম যখন আমরা ইউনিভার্ষিটিতে পড়তাম, কফি হাউসে—ওয়াই. এম. সি.-এ রেষ্টুরেণ্টে আড্ডা দিতাম। তখন আমরা সবাই সমান ছিলাম, তর্ক করলেই শত্রু মনে করতাম না। বরং শ্রদ্ধা করতাম।

'ঊর্মি, তুমি আর ভীমাপ্পাদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করো না। নানাজনে নানা কিছু ভাবতে পারে।'

'তুমি রাজনীতি কর, আমি তো করি না। সুতরাং আমার মেলামেশার কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই।'

'তবুও—

সৌমেন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না আমার কথা। শেষে আমি বাধ্য হয়ে বললাম, আমি যাদের ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, যারা আমাকে ভালবাসে, আমার কল্যাণ চায়, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম ওর কথাবার্তায়। 'তাছাড়া তোমার যেমন মতামত আছে, আমারও আছে। পলিটিক্স না করলেও সাধারণ বিচার-বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে।'

শুধু ভীমাপ্পা নয়, আমার কাছ থেকেও সৌমেন আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। ক্ষমতার জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় মানসিক, হৃদয় ঔদার্যের ভাঁটা পড়তে শুরু করে। তা না হলে সৌমেন এমন হলো কেমন করে? সৌমেন জানে না, জানতে চায় না। কিন্তু আমি জানি, দেখি ডিসেম্বর-জানুয়ারীর দারুণ শীতে বাবুরাম কেটলি নিয়ে চা কিনতে যায় দূরের কোন দোকানে। মন্ত্রী মশাই বাংলোতে থাকলে আমিও ওদের চা দিই না, দিতে পারি না। ঐসব সাধারণ

কর্মচারীদের বেশী মর্যাদা দিলে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে না। মন্ত্রীর ইজ্জত থাকে না।

গতবার সৌমেনের জন্মদিনে মিঃ ভীমাপ্পার মা সৌমেনকে নিমন্ত্রণ করেন নি, করতে সাহস করেন নি। মনে মনে ভয় ছিল যদি প্রত্যাখান করে। তবে আশীর্বাদ না করে থাকতে পারেন নি। নির্মাল্য আর নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে এসেছিলেন আমাদের বাংলোয়। রাজনৈতিক চেলা-চামুণ্ডা তাবেদার আর ব্যবসাদার-কনট্রাক্টারদের কাছ থেকে ফুলের তোড়া আর উপহার নিতে এত ব্যস্ত ছিল যে এক মুহূর্তের জন্য ভিতরে এসে নির্মাল্য নিয়েই বাইরের ড্রইংরুমে চলে গেল। প্রণাম করার অবকাশ পেল না।

একটা বিচিত্র অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাই। সেই সৌমেন, সেই আমি অথচ সেই উষ্ণতা আর অনুভব করি না। এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব করি। ডবল বেডের একটি বিরাট বিছানায় দু'জনে পাশাপাশি কাছাকাছি শুই। আগের মতই আদর করে, ভালবাসে। আমাকে নিয়ে হঠাৎ পাগল হয়ে যায়, ছেলেমানুষী করে। প্রায় আগের দিনের মতই কিন্তু তবু মনে হয় স্বাদ পালেট গেছে, সুর বদলে গেছে। আগে প্রতি মুহূর্তে মনে মনে একটা প্রত্যাশা ছিল, পূর্ণতাও ছিল। এখন নেই। আস্তে আস্তে ঐসব সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে।

কলকাতার কথা তো বাদই দিলাম, এই দিল্লীতে সৌমেন মন্ত্রী হবার পরও দিনগুলো কি মিষ্টি, কি সুন্দর লাগতো! ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গার পর বিছানা ছেড়ে ওঠাই একটা পর্ব ছিল। কিছুক্ষণ

ছেলেমানুষী, কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হবেই। কখনও নিজেদের কথা, কখনও অন্য মানুষের সুখ-দুঃখের কথা।

'উর্মি, তোমার কাছে কিছু এক্সট্রা টাকা হবে?'

'কেন তোমার চাই?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে টাকা দিয়ে তো লাভ নেই।'

'কেন?'

'কোনদিন আমার দেনা শোধ করো না।'

'তোমার কোন দেনাই শোধ করি নি?'

আমি হাসতে হাসতে জবাই দিই, করবে না কেন? একটা দেনা শোধ করলে দুটো দেনা থেকেই যায়।

সৌমেন প্রশ্ন করে, আমার পুরনো মাস্টার মশাই অমিয়বাবুর কথা তোমার মনে আছে?

'শ্যামপুকুরে থাকেন তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ....

'অমিয়বাবুর আবার কি হলো?'

'ওর মেয়ের বিয়ে। খুব দুঃখ করে একটা চিঠি লিখে কিছু সাহায্য চেয়েছেন।'

সৌমেন অমিয়বাবুকে পাঁচ শ' টাকা পাঠিয়েছিল। তখন দশ-বিশ-পঁচিশ টাকা সাহায্য হরদমই করত। কত জানা-অজানা ছেলেমেয়ে আসত নানা রকমের সাহায্যের জন্য। সবাইকে সাহায্য করতে না পারলেও চেষ্টা করত। ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুতি দিত, এই মাসের শেষে আমি কলকাতা আসছি। তখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো।

ছেলেটি মুখ কাচুমাচু করে বললো, কলকাতায় দেখা করা হবে না।

'কেন?'

'এর আগে অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পুলিশ আর অফিসাররা দেখা করতে দেয় নি।'

কথাটা শুনেই সৌমেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কি যেন ভাবছিল। ছেলেটি আবার বললো, কলকাতায় দেখা করতে পারি নি বলেই তো দিল্লী এসেছি।

সৌমেন সঙ্গে সঙ্গে পি. এ. বাবুকে ডেকে বললো, এই ছেলেটির নাম-ঠিকানা রেখে দিন। আমি এবার যখন কলকাতায় যাব, এর একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ঠিক করে চিঠি দিতে হবে।

ও পরে আমাকে বলেছিল, কি দুঃখের কথা! ছেলেটা কলকাতায় দেখা করতে না পেরে এই হাজার মাইল দূরে ছুটে এসেছে।

আমি বললাম, সাধারণ লোক দেখলেই অফিসাররা কেয়ার করে না।

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু এই গরীব বেকার ছেলেটার কত খরচ হলো বলো তো।'

আমাকে ও কিছু বলে না। কিন্তু আমি পরের দিনই জানতে পারি সৌমেন ওর কলকাতা ফেরার টিকিট কেটে দেয়। ও এই রকমই করত। অনেক দিন ধরে অনেক মানুষের উপকার করেছে। সরকারী চাকরি বিশেষ দিতে পারত না, কিন্তু নানা কারণে বড় বড় ব্যবসাদার এলেই ও দুটো-একটা চাকরি দিতে অনুরোধ করত। হাজার হোক একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অনুরোধ। বিশেষ কেউই প্রত্যাখান করতেন না। আগে আগে গোরা বা ছোট ভাই-এর একটা চিঠি নিয়ে এলেই সৌমেন উঠে পড়ে লেগে যেত। দু-পাঁচ-দশ দিন বা দু'এক মাসের মধ্যে একটা না একটা ব্যবস্থা হতোই।

পার্লামেণ্ট থাকলে আলাদা কথা, অন্যথায় ছ'টার মধ্যেই সৌমেন বাড়ী ফিরত। গাড়ী থেকে নামতে নামতেই পি. এ-কে বলতো, কাজকর্ম থাকলে রেডি করুন, আমি আসছি। দুটো ড্রইংরুম পার হয়ে সোজা ভিতরে আসতো, একেবারে আমার কাছে। ও অফিস

থেকে রওনা হলেই প্রাইভেট সেক্রেটারী বাংলোতে রেসিডেন্স পি. এ-কে খবর দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার টেলিফোনও বেজে উঠত, ম্যাডাম, এইচ. এম এক্ষুণি আসছেন। ওকে অভ্যর্থনা করার জন্য আমি তৈরী হয়েই থাকতাম। ও ঘরে ঢুকেই একেবারে হিন্দী ফিল্মষ্টারের মত আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতো, জান উর্মি, সাড়ে চারটে-পাঁচটার পর আর অফিসে মন টেকে না।'

কষ্ট করে হাসি চেপে আমি জানতে চাই, কেন?

'তুমি জান না কেন?'

ন্যাকামী করে আমি জিজ্ঞাসা করি, টায়ার্ড ফিল করো?

দুটো হাত দিয়ে আরো জোর করে আমাকে চেপে ধরে আমার মুখের পাশে মুখ রেখে বলে, তুমি ভীষণ দুষ্টু!

'কেন?'

'আমাকে আত্মসমর্পণ না করিয়ে শান্তি পাও না।'

'তার মানে?'

'যাই বল, মন্ত্রিত্ব করার চাইতে তোমার সঙ্গে প্রেম করা অনেক ইণ্টারেষ্টিং।'

'তাই নাকি?'

'সত্যি উর্মি!' সৌমেন উদাস হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে বলতো, যাই বলো লেকচারারশিপের মত আরামের চাকরি আর হয় না। দেড়টা-দুটো বা আড়াইটে-তিনটের সময় বাড়ী ফিরে তোমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকার মত আরাম...

কখনও কখনও বলতো, বেশী দিন এখানে থাকব না।

আমি জিজ্ঞাসা করতাম, কেন?

'হাজার হোক আমরা অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। এই এত বড় বাংলোতে বেশী দিন থাকলে কি আর পরে রাজবল্লভ পাড়ার ঐ বাড়ীতে মন টিকবে?'

আমি হাসি।

'না, না, উর্মি, হাসির কথা নয়। আমি সিরিয়াসলি বলছি। বাড়ীতে অফিসে এয়ার-কণ্ডিসনড্ ঘরে থাকছি, মোটরে চড়ছি, বাইরে গেলেই প্লেনে ঘুরছি, কলকাতা ছাড়া অন্য সব জায়গায় গিয়ে রাজভবনে থাকছি। বেশী দিন এসব এনজয় করলে পরে লেকচারারশিপ তো দূরের কথা ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েও শান্তি পাব না।'

এক নিঃশ্বাসে সৌমেন কথাগুলো বলে যায়। আমাকে খুশী করার জন্য নয়, নিজেকে খুশী করার জন্য কথাগুলো বলতো। না বলে পারত না। ও একবার নয়, বহুবার আমাকে, আরো অনেককে বলেছে, পাঁচ বছরের বেশী মন্ত্রিত্ব করবে না। পাঁচ বছর পর ফিরে যাবে কলেজে, রাজবল্লভ পাড়ার ঐ বাড়ীতে, দাদা-বৌদি মা আর অশোক-মানুর কাছে। আগের মত ছোট ভাই-গোরা-দেবী-অমিত বাবলুকে নিয়ে পাড়ার লোকের উপকার করার চেষ্টা করবে।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করি, আর কি করবে?

'আর?' সৌমেন এক মুহূর্তের জন্য ভাবে। 'আর রোজ সন্ধ্যার পর অজিতের চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেব।'

আমি আবার হাসি।

রাজবল্লভ পাড়ার মোড়ে গিরীশ এভিনিউয়ের উপর ছোট্ট গলির কোণায় অজিতের চায়ের দোকান। একটা তোলা উনুন, একটা কেটলি, একটা দুধের কড়া, ছ'টা ছোট ছোট গেলাস হচ্ছে ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেণ্ট। আর র মেটিরিয়াল হচ্ছে কোয়ার্টার পাউণ্ড চা, এক সের দুধ আর এক কৌটো চিনি। এছাড়া কিছু মাটির ভাঁড়। সাধারণ খদ্দেরদের জন্য একটা নড়বড়ে বেঞ্চি, আর যারা ভি-আই-পি, যারা টেবিল রিজার্ভেশন করতে চান, তাদের জন্য গোটা কতক ব্যাটারীর খালি খোল উল্টো করে ফুটপাতের চারপাশে ছড়ান। অজিত কোথাও একটা সামান্য চাকরি করে। দোকান খোলে সন্ধ্যার দিকে। ছ'টা নাগাদ। বন্ধ হয় রাত এগারটায়। যেদিন

ছোট ভাইরা দল বেঁধে নাইট শোতে সিনেমায় যায়, সেদিন অজিতের চায়ের দোকানও ন'টা নাগাদ বন্ধ হয়। অনেক দিন আমি আর সৌমেন বেড়িয়ে ফেরার সময় অজিতকে দোকান বন্ধের তোড়জোড় করতে দেখলে ও ছোটভাইকে জিজ্ঞাসা করত, কি ছোটভাই, আজ এত তাড়াতাড়ি তোমাদের বাগবাজার ফিরপো বন্ধ হচ্ছে?

ছোট ভাই এগিয়ে এসে জবাব দেয়, আজ যে ড্রাই ডে।

কোন দিন অজিতের দোকানের কাছাকাছি কোন বাচ্চা মেয়ে ন্যাংটা হয়ে ঘোরাঘুরি করলেই দেবী বলবে, হ্যাঁরে অজিত, এই কি আমাদের ক্যাবারে আর্টিষ্ট?

অজিত শুধু চায়ের দোকান চালায় না, সারা পাড়ার রিসেপসনিষ্ট। সারা পাড়ার সবার খোঁজখবর রাখে। ছোট ভাই বলে, ইয়েস সেক্রেটারী, গোরার কি খবর?

'গোরাদা মানিকতলায় গেলেন।'

'কখন ফিরবে জানিস?'

'ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবেন।' অজিত জানায়।

কোন দিন হয়ত অফিস থেকে ফেরার পথে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে সৌমেনদা বাড়ী আছেন?

'প্রফেসারদা আর বৌদি ম্যাটিনীতে সিনেমা গিয়েছেন।'

নতুন নতুন মন্ত্রী হবার পরও কলকাতায় গেলে সৌমেন অজিতের দোকানে চা খেয়েছে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গল্পগুজব করেছে। এখন? সৌমেন তত্ব প্রচার করে, বাংলাদেশের কিছু হবে কেমন করে? জোয়ান জোয়ান ছেলেরা যদি সারা দিন চায়ের দোকানে বসেই আড্ডা দেয়, তাহলে কি হবে ওদের?

আমি প্রতিবাদ করি না। সব মন্ত্রীদের মত আমার স্বামীও ভাবে ওদের মত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ আর কেউ হয় না। পৃথিবীর সবকিছু বোঝে, জানে। সব সমস্যার সমাধান ওদের পকেটে থাকে। শুধু ওদের পরামর্শ মত দেশের লোককে চলতে হবে।

'লুক এ্যাট দি পানজাব। মরুভূমিতে সোনা ফলাচ্ছে। এইত সেদিন অষ্ট্রেলিয়ান হাই-কমিশনার আমাকে বলছিলেন পোষ্ট-ওয়ার জার্মানদের চাইতেও পাঞ্জাবীরা অনেক বেশী সাকসেস্‌ফুল এ্যাণ্ড আমাদের তুলনায় ওরা রিয়েলি ভেরী রিচ।'

সৌমেনের কথা শুনেই বুঝতে পারি কোন বাঙ্গালীর ছেলে এসে নিশ্চয়ই একটা সামান্য কেরানীর চাকরির জন্য ধরেছিল।

নাকটা উঁচু করে মুখ বিকৃতি করে সৌমেন বলে যায়, শুধু চাকরি! চাকরি! চাকরি! তাও আবার কেরানীগিরির চাকরি। মুখে বড় বড় বক্তৃতা দেবে কিন্তু কেরানীগিরি ছাড়া বাবুরা কিছু করতে পারবেন না। সবাই ভাবে মন্ত্রী হয়ে আমি যেন কেরানীগিরির দেবার ঠিকাদারী নিয়েছি।

আস্তে আস্তে আগেকার সব ধারণা, মনোবৃত্তি, এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের ধারা ও নিজের রুচি পর্যন্ত পাল্টে গেছে। আমাদের হাসি-ঠাট্টা গান-ভালবাসা হারিয়ে গেছে। এখন ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গলে সৌমেন আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় না। মনের কথা বলে না, স্বপ্নের জাল বুনে সময় নষ্ট করে না।

আমাদের শোবার ঘরে একটা টেলিফোন আছে। এ টেলিফোনের নম্বর টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে নেই। বাইরের কেউ এ টেলিফোনের কথা জানেই না। এমন কি পার্সোন্যাল ষ্টাফরা পর্যন্ত জানে না। সারাদিন যেন এই টেলিফোনটার প্রাণ থাকে না। শুধু ভোরবেলায় আর অনেক রাত্রে জীবন্ত হয়। সৌমেনের আদরে নয়, এই টেলিফোনের রিং শুনেই আজকাল আমার ঘুম ভাঙ্গে। শুনতে পাই শুধু সৌমেনের কথা। কিন্তু ওর কথা শুনেই বুঝতে পারি ষ্টীল এ্যাণ্ড মাইন্স মন্ত্রী কৃষ্ণস্বামীর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে, ইয়েস, ইয়েস, তুমি আজ লাঞ্চের সময় আমার বাড়ী এসে কাগজপত্র নিয়ে যেও। মোহনলাল যখন এইসব ঘটনা পার্লামেণ্টে ফাঁস করবে তখন দেখো কি কাণ্ডটা হয়।

তিনদিন আগেই মিঃ কৃষ্ণস্বামী সস্ত্রীক আমাদের এখানে ডিনার খেয়ে গেছেন। খাওয়া-দাওয়ার পর ভিতরের লনে আমরা চারজনে অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্পগুজব করলাম। এমন কি সৌমেনের জন্য আমাকে একটা গান পর্যন্ত শোনাতে হলো ওদের। কি দারুণ খুশী হলেন ওরা দু'জনে। সামনের শনিবার কি রবিবার আমরা ওদের ওখানে খেতে যাব। এই বন্ধুত্ব, এই হৃদ্যতার পিছনে কি জঘন্য নোংরামীর কারবার চালাচ্ছে সৌমেন! ভাবলেও ঘেন্না লাগে। মনটাও তেতো হয়ে যায়।

সৌমেন প্রথমবার যখন মন্ত্রী হয়েছিল, তখন এইসব নোংরামী, ষড়যন্ত্রে ও নিজেকে জড়াতো না। দ্বিতীয়বার মন্ত্রী হবার পর থেকেই এইসব শুরু হয়েছে। এখন নোংরামী বা ষড়যন্ত্র না করে মন্ত্রীত্ব করার কথা ও ভাবতেই পারে না। দিল্লীতে দু'জন মাত্র বাঙ্গালী মন্ত্রী। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন দু'টি ভাই। গৌড়-নিতাই। সৌমেন তো দাদা বলতে অজ্ঞান; দাদাও ভাই বলতে আত্মহারা। অথচ দু'জনেই দু'জনের সর্বনাশ করতে মত্ত।

আমি জানি, বুঝি, দেখি। কিন্তু চুপ করে থাকি। আমি মন্ত্রী পত্নী, আমি ম্যাডাম। আমাকেও অনেকে খাতির করেন, সৌজন্য দেখান। অনেক সময় আমাকেও সভা-সমিতিতেও যেতে হয়। মন্ত্রীর পাশে বসতে হয়। সৌমেনের গলায় মালা দেয়, আমার হাতে ফুলের তোড়া। ও বক্তৃতা দেয়। আমি শুনি। মনের মধ্যে যাই থাকুক না কেন, আমার মুখখানা হাসি মাখা থাকে। খুশী-খুশী ভাব থাকে। বহু অনুষ্ঠানে আমার হাত থেকে পুরস্কার নেয় কতজনে। কখনও সরকারী, কখনও বেসরকারী ফটোগ্রাফাররা ছবি তোলেন। বহুজনের বাড়ীতে যে সব ফটো ফ্রেমে বাঁধান থাকে। আমাদের এ্যালবাম প্রেজেণ্ট করে। আমি বা সৌমেন হাসিমুখে সে এ্যালবাম গ্রহণ করি। হয়ত দু'পাঁচ মিনিটের জন্য একবার দেখি। আবার কখনও দেখি না। দু'জনের কেউই দেখি না। সৌমেনের কাছে

ঐসব ছবির কোন দাম নেই। ঐসব সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছবি দেখে আজকাল আর ও খুশী হয় না। পাঁচ বছরে একবার শুধু ঐ ধরণের পোড়া পোড়া ঝলসে যাওয়া কঙ্কালসার মানুষগুলোকে ও মনে করে। একবার শুধু ওদের কাছে যায়। স্বেচ্ছায়। নিজের প্রয়োজনে। ক্ষমতার লোভে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার পর সৌমেন রায় সবার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যায়। আমি ওর স্ত্রী। আমি উর্মি। ইউনিভার্সিটির বান্ধবী। একদিন সুখে-দুঃখে সমানভাবে আমাকে চাইত। আমার কাছে ছুটে আসত। আমাকে কাছে পেলে ওর মন ভরে যেত। আজও আমার কাছে, পাশে শোয়। কখনও কখনও আমাকে নিয়েই পাগলামী করে, মাতলামী করে। কিন্তু তবুও যেন সৌমেন আমার কাছের মানুষ নয়। ও যেন আমার অনেক দূরের মানুষ!

আজকাল মাঝে মাঝে আমার হঠাৎ মনে হয় শেখর কি আমাকে ভালবাসত?

জানি না।

ছয়

জানি না বললেই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়? নাকি উত্তর দেওয়া শেষ হয়? মনের মধ্যে কিছু কথা, হয়ত কিছু কাহিনী থেকে যায়। শেখর চ্যাটার্জী সম্পর্কেও কি কিছু মনের মধ্যে জমা আছে?

ঠিক জানি না। বুঝতে পারি না। কিন্তু কেমন যেন একটু সন্দেহ হচ্ছে।

আমার আলমারীতে অনেকগুলো এ্যালবাম আর তিন-চারটে অটোগ্রাফের খাতা আছে। এইসব এ্যালব্যাম আর অটোগ্রাফের খাতায় আমার বন্ধুবান্ধব প্রিয়জনের অনেক ছবি আর সই আছে। এমন কি আমার স্কুলের বন্ধুদের পর্যন্ত। আমার স্পষ্ট মনে আছে কমলা গার্লস স্কুলের সেইসব বন্ধুদের কথা। বাণী, রত্না, অনিমা, প্রীতি, নন্দা, উষা। আরো কতজনের কথা। ক্লাস নাইনে উর্মিলা ব্যানার্জী ভর্তি হলো। খুব ভাব ছিল আমাদের দু'জনের। আমি ওকে উর্মি বলতাম, আর ও আমাকে মালা বলতো। উর্মিলা ব্যানার্জীর বাবা বদলীর চাকরি করতেন। সেজন্য ওকে নানা জায়গার নানা স্কুলে পড়তে হয়েছে। এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে যাবার আগে ও অটোগ্রাফের খাতায় বন্ধুদের সই করিয়ে নিত। ওর

দেখাদেখি আমরা অনেকেই অটোগ্রাফের খাতা কিনে বন্ধুদের সই নিতে শুরু করলাম। কলেজে নতুন অটোগ্রাফের খাতা কিনলাম। ইউনিভার্সিটিতেও কিনেছি।

এ্যালবামের পিছনে অটোগ্রাফের খাতাগুলো ছিল। এ্যালবাম নেবার সময় দেখি নি। রাখতে গিয়ে নজর পড়ল। সব অটোগ্রাফের খাতাগুলো নিয়ে বারান্দায় ফিরে এলাম।

কি করব? হাতে কোন কাজ নেই। কথা বলার কোন লোক নেই। সৌমেন সিঙ্গাপুরে। একটা ছেলেমেয়ে হলেও তাদের দেখাশুনা করে দিন কাটাতে পারতাম, কিন্তু তাও হলো না। নারীত্বের পূর্ণ প্রকাশ আমার হলো না। আমি হেরে গেছি। এখন বোধহয় আমার হেরে যাবার দিন এসেছে। সব কিছুতেই হেরে যাচ্ছি। নিজের কাছেও হেরে যাচ্ছি নাকি?

জানি না।

এই অটোগ্রাফের খাতাতে প্রায় বন্ধুরাই কিছু না কিছু লিখেছে। কেউ ইংরেজিতে, কেউ বাংলায়। কেউ দু'চার লাইনের কোটেশন লিখেছে, কেউ বা নিজের কথাই লিখেছে। হঠাৎ শেখরের লেখাটা নজরে পড়ল—তুমি ভুলে যাবে, আমি ভুলব না।

তুমি ভুলে যাবে, আমি ভুলব না।

এই ছোট্ট একটা লাইন অনেকবার পড়লাম। পড়তাম না, কিন্তু চোখের সামনে কতকগুলো ছোটখাট কথা, ঘটনা মনে পড়ল। মনে পড়ছে।

সৌমেন মন্ত্রী হবার মাস দুয়েক পরে লণ্ডন থেকে শেখরের একটা চিঠি এসে হাজির।····এসেছিলাম পি, এইচ-ডি করব বলে। হলো না। সামান্য অধ্যাপনা করছি। পাশপোর্টের মেয়াদ বাড়াবার জন্য গতকাল ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়েছিলাম। পাঁচ মিনিটের কাজ হলেও দু'তিন ঘণ্টা কাটাতে হয়। ইণ্ডিয়া হাউস থেকে আমার অস্থায়ী বাসস্থান অনেক দূরে। যাতায়াত করতেই প্রায় এক পাউণ্ড ব্যয়

হয়। সেজন্য নীচের তলার রিডিং রুমেই সময়টা কাটিয়ে দিলাম। এই রিডিং রুমে বসে নানারকম সরকারী-বেসরকারী পত্র-পত্রিকা পড়তে পড়তেই জানতে পারলাম তুমি মন্ত্রী হয়েছ। একবার না, বহুবার তোমার জীবনীটা পড়লাম, অনেকক্ষণ ধরে তোমার ছবিটাও দেখলাম। গর্বে, খুশীতে উত্তেজিত হয়ে কতজনকে যে জানালাম আমার বন্ধু মন্ত্রী হয়েছে, সে আর কি বলব !

এরোগ্রামের সবটুকু জায়গা ভরে লিখেছিল শেখর। একেবারে শেষে আমাকে লিখেছিল, তুমি আমাকে ভুলে গেছ, আমি তোমাকে ভুলি নি।

আমরা দুজনেই ওকে চিঠি দিয়েছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম ওর খবরাখবর। খামে তিন-চার পাতার জবাব এসেছিল। শেখরের একমাত্র বোন বিধবা হবার কিছুদিনের মধ্যেই ওর বাবার সেকেণ্ড ষ্ট্রোক হয়। মারা যান। মাসে মাসে টাকা আসা বন্ধ হওয়ায় ডক্টরেটের থিসিস শেষ করতে পারল না। সামান্য একটা পার্ট-টাইম অধ্যাপনার কাজ নিয়ে লণ্ডনেই আছে। কিছুদিন চিঠিপত্রের লেনদেন চলার পর যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রায় চার-পাঁচ বছর পরে ইন্দ্রানী একদিন টেলিফোন করে খবর দিল, শেখর এসেছে।

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছে ?'

'আমাদের কাছেই আছে।'

'কবে এসেছে ?'

'গত সোমবার।'

'সোমবার এসেছে আর আজ খবর দিচ্ছিস ?'

'কি করব বল ? যখনই তোদের খবর দিতে চেয়েছি তখনই ও বলেছে মিনিষ্টার বা তাঁর ওয়াইফকে বিরক্ত করো না।'

ঐ-দিন রাত্রেই দিল্লী-হাওড়া এক্সপ্রেসে শেখর কলকাতা ফিরে যায়। স্টেশন যাবার পথে আমাদের এখানে এসেছিল। সৌমেন ছিল না। অশোকা হোটেলে এক সরকারী ডিনারে গিয়েছিল। আমার সঙ্গেই দশ-পনের মিনিট কথা বলে চলে গেল। যাবার সময় বললো, ভেবেছিলাম আসব না, কিন্তু না এসে পারলাম না।

'না এলে সত্যি দুঃখ পেতাম।'

শেখর একটু শুকনো হাসি হাসল, তোমার আবার দুঃখ! মন্ত্রী-পত্নীর কি কোন দুঃখ থাকতে পারে?

'আমি তো আর মানুষ নেই, দেবতা হয়ে গেছি।'

'অন্তত আমাদের দেশে মন্ত্রী বা মন্ত্রী-পত্নীরা দেবতাই!'

কথার মোড় ঘুরিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আবার কবে দিল্লী আসছ?

'তোমাদের ইউ-পি-এস-সি-র একজামিনার হয়েছি। মনে হয় প্রায়ই আসতে হবে।'

'এবার এলে আমাদের এখানেই থেকো।'

'থাকব ইন্দ্রানীর ওখানেই, কিন্তু তোমার এখানেও আসব। তাছাড়া সৌমেনের সঙ্গে দেখা হলো না....

ট্যাক্সিতে উঠে জানলার কাছে মুখ এগিয়ে শেখর বললো, ঊর্মিলা, এবার দিল্লী এলে একটা সিনেমা দেখাবে?

'নিশ্চয়ই দেখাব।'

'ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখে দেখে এখন সিনেমা দেখতে গেলেই তোমার কথা মনে হয়।'

গাছে কত মুকুল হয়, কিন্তু সব মুকুল মুকুলিত হয় না। হতে পারে না। ঝরে যায়, পড়ে যায়। কখনও রোদ্দুরের তাপে, কখনও ঝড়বৃষ্টির অত্যাচারে নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের মনের মধ্যেও অনেক স্বপ্ন, অনেক ইচ্ছার মুকুল ধরে। সেসব স্বপ্ন, ইচ্ছার মুকুল মুকুলিত হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। নানা কারণে হতে পারে না। পারি-

বারিক, ব্যক্তিগত।)মনে হয়, সন্দেহ হয় শেখরের মনের মধ্যেও কোন স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল। জানি না, বুঝতে পারি না আমাকে নিয়েই ও কোন স্বপ্ন দেখে কি না। কথায়-বার্তায় আলাপ-আলোচনায় বা ব্যবহারে কিছু বলে না, প্রকাশ করে না কিন্তু তবু যেন আমার সন্দেহ হয়। একটু যেন আভাস পাই। শ্রাবণে সারা আকাশ জুড়ে মেঘ থাকে, সূর্য দেখা যায় না। কিন্তু সূর্যরশ্মি ? দিনের আলো ?

তিনজনের জন্যই টিকিট কাটা হয়েছিল। তিনজনেই গিয়েছিলাম। অনেক দিন পরে সৌমেন আর শেখরের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে ইউনিভার্সিটির দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। মুখে কিছু বললাম না। সৌমেনই বললো, অনেকদিন পরে আবার ইউনিভার্সিটির দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে, তাই না শেখর ?

শেখর আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কি উর্মিলা, তোমারও মনে পড়ছে নাকি ?

আমি বললাম, পড়ছে বৈকি।

শেখর বললো, তোমাদের তো মনে পড়ার কথা নয়।

আমরা দুজনেই প্রায় একসঙ্গে জানতে চাইলাম, কেন ?

'মানুষ সুখের কথাই মনে রাখে, দুঃখের দিনের কথা ভুলে যায়। তোমরা এত সুখে; আনন্দে আছ যে ওসব কথা মনে না পড়াই স্বাভাবিক।'

শেখরের কথায় একটু অভিমান, হতাশার সুর পেলাম আমি। সৌমেন নিশ্চয়ই অতটা মন দিয়ে কথাটা শোনেনি ; কথাটা শুনলেও ঠিক সুর ধরতে পারেনি। ও বললো, না, শেখর, ওসব দিনের কথা কেউ ভুলতে পারে না।

সৌমেন পুরো ছবিটি দেখবে না। হোম মিনিষ্টারের বাড়ী ডিনারে যাবে। ও ধারে বসল। তার পর আমি। আমার ওপাশে শেখর। তখনও ছবি আরম্ভ হবার কয়েক মিনিট বাকি আছে। সৌমেন বললো, জান শেখর, মন্ত্রী হবার একটা ট্রাজেডি

হচ্ছে কখনও পুরো সিনেমা দেখার সুযোগ পাই না।

শেখর হাসতে হাসতে বললো, বড় কলকারখানার মালিক হলে ছোটখাট ধর্মঘট-লক আউটের লোকসান সহ্য করতে হয়।

'তা ঠিক।' সৌমেন সমর্থন জানাল।

'তোমার এই ট্রাজেডির কথা আর কাউকে বলো না....'

'কেন?'

'শুনলে লোকে হাসবে।'

ছবি শুরু হলো। ইণ্টারভ্যাল হলো। আবার ছবি শুরু হলো। সওয়া আটটায় ডিনার। ঠিক আটটা পাঁচে সেকেণ্ড পি. এ. মিঃ সাবুর সৌমেনের পাশে এসে খুব চাপা গলায় ডাকল, স্যার!

সৌমেন চলে গেল। আমি আর শেখর পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখলাম। হল থেকে বেরুবার সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগল?

'এত কাল পরে সিনেমা দেখছি, খারাপ লাগবে কেন?'

'তুমি বুঝি খুব কম সিনেমা দেখো?'

'প্রাকটিক্যালি সিনেমা দেখা ছেড়েই দিয়েছি।'

'কেন?'

'একলা-একলা সিনেমা দেখা যায়?'

'কাউকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই পার।'

'কে আমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবে? তাছাড়া যার-তার সঙ্গে গেলে কি আনন্দ পাওয়া যায়?'

গাড়ীতে আসার সময় দুজনের কেউই কোন কথা বললাম না। বোধহয় বলতে পারলাম না। পরে একবার শেখরকে জিজ্ঞাসা করলাম, বয়স তো হলো, এবার একটা বিয়ে কর।

শেখর হাসল, বলো বিয়ের বয়স পার হয়ে গেল।

'যাই হোক এবার একটা বিয়ে কর।'

শেখর একটু হাসল, আমার কথার জবাব দিল না।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নাকি কাউকে ভালবেসেছ ?

'কাউকে ভালবাসার মত সাহস আমার নেই। সবার থাকে না ঊর্মিলা।'

'ভালবাসা তো মনের ব্যাপার...'

'কিন্তু সে ভালবাসা প্রকাশের জন্য সাহস চাই। কাউকে ভাল-বাসি একথা মুখ ফুটে বলতে আমার কষ্ট হয়, দুঃখ হয়, হয়ত অপমানও হয়।'

অনেক দিন হলো শেখর আসে না। হয়ত আসে কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করে না। আমি মাঝে মাঝে ইন্দ্রানীকে ফোন করলে ওর কথা জিজ্ঞাসা করি। শেখর কোনদিনই কাউকে চিঠি দেয় না। কোন কোন বার বিজয়া বা নববর্ষে একটা কার্ড পাঠায়। যোগাযোগ নেই বললেই চলে। কিন্তু আজ হঠাৎ পুরনো দিনের অটোগ্রাফ খাতাগুলো দেখে শেখরের কথা মনে পড়ছে। মনের মধ্যে নানা কথা, নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে।

হঠাৎ বাগবাজারের দিনগুলোর কথা মনে হলো। আলতো করে সৌমেনের হাতটা আমার গলার থেকে ছাড়িয়ে বিছানা থেকে নামতাম। একটু তাড়াহুড়ো করলেই ও এমন করে আমাকে জড়িয়ে ধরত যে কিছুতেই উঠতে পারতাম না। নীচে গিয়ে চা করে সবাইকে দিতাম। তারপর নীচে বসার ঘরে সবাই মিলে ছোট্ট একটু আড্ডা। আমি বেশীক্ষণ আড্ডা দিতাম না। কলেজে যাবার জন্য তৈরী হতাম। কলেজ থেকে ফেরার একটু আগে বা পরে সৌমেন বেরুত। আমি কলেজ থেকে এসে উপরে ওঠার আগে রান্নাঘরে উঁকি দিতাম। দিদি বলতেন, তাড়াতাড়ি উপরে যাও। নায়ক এখনও আছেন।

আমি হয়ত কিছু জবাব দিতাম। দিদি সে কথার জবাব না দিয়েই বলতেন, দরজা-জানলার পর্দাগুলো টেনে দিও ঊর্মি।

সত্যি, দরজা-জানলার পর্দা না টেনে উপায় ছিল না।

আর এখন?

অফিস ঘরে ভিজিটার্স'দের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে বেরিয়ে যায়, তা জানতেই পারি না অধিকাংশ দিন।

রাত্রে আমরা তুজনে আর দাদা-দিদি একসঙ্গে খেতে বসলেও তুপুরবেলায় শুধু আমি আর দিদি থাকতাম। কি দারুণ আড্ডা হতো! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমরা গল্প করতাম। কি নিয়ে গল্প হতো না আমাদের? এখনও কলকাতায় গেলে আমার আর দিদির আড্ডা হবেই। দাদা ঠাট্টা করে বলেন, দেখছি তোমরাও একটা রোটারি ক্লাব খুলেছ।

মাসের মধ্যে পনের-কুড়ি দিন সৌমেন বাড়ীতে খায় না। বাইরে কোথাও না কোথাও নেমন্তন্ন থাকে। সরকারীর চাইতে বেসরকারী, ব্যক্তিগত আমন্ত্রণই বেশী। মন্ত্রী হবার পর হঠাৎ শুভাকাঙ্খীর সংখ্যা অসম্ভবভাবে বেড়ে যায়। রাজ্যসভার মিঃ সরকার বহুদিন ধরে দিল্লী আছেন। পাঁচ বছরের জন্য ডেপুটি মিনিষ্টারও হয়েছিলেন। উনি এদিকে এলেই আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। কখনও সৌমেন থাকে, কখনও থাকে না। সৌমেন থাকলেও পাঁচ মিনিট ওর সঙ্গে কথা বলে আমার সঙ্গে গল্প করেন। অধিকাংশই দিল্লীর গল্প।

'জান দিদি, আগে সত্যি বেশ আনন্দে দিনগুলো কাটত। প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতাম ভারতবর্ষ আমার দেশ। আমরা সবাই সমান, কেউ ছোট, কেউ বড় নয়....

মিঃ সরকার কনষ্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লীর সদস্য ছিলেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করেন এঁরাই। এঁর কাছেই গল্প শুনেছি প্রয়োজন হলেই সর্বভারতীয় নেতারা সাধারণ মেম্বারদের বাড়ী আসতেন। নেতাদের—মিনিষ্টারদের অফিসে যাবার আগে টেলিফোন করে গেলেও সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ীতে দেখা করার জন্য প্রাইভেট সেক্রেটারী বা পার্সোন্যাল এ্যাসিসট্যান্টকে বার বার অনুরোধ করতে হতো না। ইচ্ছা মতন, প্রয়োজন মত বাংলোয়

হাজির হলেই হতো। 'দিদি, আজকাল সব পাল্টে গেছে। আমরাও সাহেবদের মত প্রভুত্ব করতে শুরু করেছি।'

আমি সমর্থন জানাই, ঠিকই বলেছেন দাদা।

'আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই বড় সরল, বড় ধর্মভীরু। তারা আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে কিন্তু আমরা তাদের বিশ্বাসও করি না, শ্রদ্ধাও করি না। বরং ওদের অবিশ্বাস করি, ঘেন্না করি আর দিন-রাত্তির ওদের ঠকাচ্ছি।'

আমি চুপ করে ওর কথা শুনি।

'আমি যখন প্রথম দিল্লীতে এলাম তখন কিছু রাজনৈতিক সহকর্মীদের ছাড়া আর কাউকে চিনতাম না। কনষ্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেমব্লীর মেম্বার থাকার সময় সামান্য কিছু নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। কিন্তু মাত্র একটা টার্মের জন্য সামান্য ডেপুটি মিনিষ্টার হয়ে সারা দেশে আমার হাজার হাজার নতুন বন্ধু হলো...

আমি হাসলাম।

'হাসছ দিদি? তুমি আমার মেয়ের মত; তোমাকে একটাও মিথ্যে কথা বলব না...

'না, না, দাদা, আপনি মিথ্যে বলবেন কেন?'

'আবার যেদিন থেকে মন্ত্রীত্ব গেছে, সেই দিন থেকেই আমার সব নতুন বন্ধুরা আমাকে ভুলে গেছে।'

সরকারদার কথা আমি অবিশ্বাস করি না। অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। আরো অনেকের কাছে এসব কথা শুনেছি। তাছাড়া আমিও তো দেখছি। দেখছি মৌসুমী ফুলের মত কিভাবে বন্ধুরাও পাল্টে যাচ্ছে। সৌমেন যখন ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং-এর মন্ত্রী হলো তখন সারা ভারতের ফিল্ম প্রডিউসার, খবরের কাগজের মালিকরা আর বড় বড় আর্টিষ্টরা ওর ব্যক্তিগত বন্ধু হয়ে গেল। আমি তো অবাক। অনেকে ওর নাম ধরে ডাকত। সৌমেনও ওদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যেন ওরা একসঙ্গে স্কুল-

কলেজে পড়েছে। বোম্বে-মাদ্রাজের ফিল্ম প্রডিউসাররা, খবরের কাগজের মালিকরা আমাদের এখানে এলেই তু'চারটে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাংলা কথাবার্তা পর্যন্ত বলতেন। ওদের মুখে বাংলা কথা শুনতে বেশ লাগত। আমি হাসতাম। আমার হাসি দেখে বোম্বের বিখ্যাত প্রডিউসার মিঃ তলওয়ার বলতেন, দিদি আমি বাংলা জানে। আমি বাংলা ভালবাসে। পঙ্কজ মল্লিকদার সারা রেকর্ড আমার ভাল লাগে।

'তাই নাকি?'

'হা দিদি। আমি বাংলা পিকচার প্রডিউস করবে।'

'খুব ভাল কথা।'

সৌমেন প্রায়ই বোম্বে যেত। হিন্দী ফিল্মের প্রায় সব হোমরা চোমরাদের সঙ্গেই ওর ভাব ছিল। সুটিং-এর জন্য দিল্লী এলে বা কাশ্মীর যাতায়াতের পথে তু'একদিন এখানে থাকলে ওরা সবাই অশোকা হোটেলে থাকতেন। কিন্তু প্রায় সবাই আমাদের বাংলোয় আসতেন দেখা করতে। কদাচিৎ কখনও তু'একজন আর্টিষ্ট আমাদের বাংলোয় থাকতেন। হিন্দী ফিল্মের কয়েকজন নামকরা অভিনেত্রীও আমাদের এখানে থেকেছেন। প্রথম প্রথম মনে হতো নিছক হৃদ্যতা। আস্তে আস্তে বুঝলাম হৃদ্যতা নয়, নিছক স্বার্থের তাগিদেই এদের আগমন। যারা সৌমেনকে বেশী খাতির করত, তাদের ফিল্ম নানাদেশের ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে যেত, তারাই ফিল্ম ডেলিগেশনে ঘুরতেন সারা পৃথিবী, তাদের নামই ইনফরমেশন—ব্রডকাষ্টিং মিনিষ্ট্রি থেকে হোম মিনিষ্ট্রিতে সুপারিশ করা হতো পদ্মশ্রী, পদ্ম-বিভূষণের জন্য।

পরের বার সৌমেন ইরিগেশন এ্যাণ্ড পাওয়ার মিনিষ্টার হবার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ইলেকট্রিক্যাল ফার্মের বড় বড় ম্যানেজিং ডিরেক্টার আর চীফ এঞ্জিনিয়ারের দল ওর বন্ধু হলো। সৌমেন ভুলে গেল ফিল্মওয়ালাদের, ফিল্মষ্টাররাও আর আমাদের কাছে আসত না।

শিল্পপতি আর বড় বড় কনট্রাকটার্স ফার্মের মালিকরাই আমাদের পরম শুভাকাঙ্খী হয়ে উঠলেন।

কালবৈশাখীর ঝড়ের মত মাতলামী করেই সৌমেনের দিন কাটে। একটি মুহূর্তের জন্য সে নিঃসঙ্গ নয়। ওর চারপাশে মানুষের ভীড়। অনুগ্রহপ্রার্থীর ভীড়। তাবেদারের ভীড়। সবাই ওকে খুশী করতে চায়। কিন্তু আমি? আমাকে কে দেখে? কে আমাকে খুশী করতে চায়? সুখী করতে চায়?

আমার হুকুম তামিল করার জন্যও কম লোক নেই। কিন্তু শুধু হুকুম তামিল করার লোক থাকলেই কি মন ভরে? আমার আমিকে খুশী করার জন্য যা চাই, যা প্রয়োজন, তার কিছুই আমি পেলাম না। অন্যান্য কিছু মন্ত্রীর মত সৌমেন চরিত্রহীন নয় কিন্তু তাতে কি লাভ? স্বামী ভাল অথচ উদাসীন হলে পৃথিবীর কোন স্ত্রীর মন ভরে?

আগে আগে ছেলেমেয়ে না হবার জন্য সৌমেন দুঃখবোধ করত, অনুশোচনা করত, আমার নিঃসঙ্গতার জন্য সমবেদনা জানাত। আজকাল আর ও দুঃখবোধ করে না, আমার মনের বেদনা অনুভব করে না। আগে আগে অশোক-মানু ছুটি হলেই ছুটে আসত দিল্লী। এখন খুব কম আসে। দিদি বুঝে গেছেন, দাদা জানেন, সৌমেন পাল্টে গেছে। অশোক-মানুকে ও আর আগের মত ভালবাসে না, পছন্দ করে না। ওরা নাকি ঠিক স্মার্ট না। ওরা নাকি ক্যাবলা, মন্ত্রীর বাংলোতে থাকার ঠিক উপযুক্ত নয়। আগে গোরা, ছোটভাই, অমিত, দেবী বা ওদের বন্ধুবান্ধবরা দিল্লী এলে সৌমেন কত খুশী হতো। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত। আমাদের শোবার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা হতো। নিজে ওদের সঙ্গে লালকেল্লা-কুতব মিনার-ওখলা বেড়াতে যেত। মতি-মহলে খাওয়াতো। এখন ওরা বিশেষ আসে না। এলেও কালীবাড়ীর ধর্মশালায় আগের থেকেই ব্যবস্থা করে রাখা হয়।

আমি শুধু দেখি আর ভাবি। আপন মনে সব কিছু ভাবি। অবাক হয়ে, বিস্মিত হয়ে ভাবি। ভিতরের লনে পায়চারি করতে করতে ভাবি, পুরনো দিনগুলোর কথা, ভিতরের বারান্দায় বসে বসে মনে পড়ে সমস্ত বিবর্তনের ইতিহাস। আগে রোজ সকালে খবরের কাগজের পাতায় সৌমেনের নাম দেখে গর্বে, আনন্দে বুক ভরে যেত। কিন্তু এখন অনুশোচনা হয়। রাগ হয়। এই নাম, যশ, প্রতিপত্তির জন্যই তো সৌমেন এমন করে পাল্টে গেল, হারিয়ে গেল আমার কাছ থেকে।

দিল্লীর বসন্ত বড় ক্ষণস্থায়ী। একদিন খবরের কাগজের পাতায় ওর নাম ছাপা নিশ্চয়ই বন্ধ হবে, দিনরাত্রি ধরে তাবেদারদের আসা থেমে যাবে, জনপথের এই বাংলো ছাড়তে হবে, প্লেনে চড়ে দেশ-বিদেশ যাওয়ার পালা শেষ হবে, হাজার-হাজার লাখ-লাখ সরকারী কর্মচারী আর সেলাম দেবে না, নিজের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করার জন্য প্রাইভেট সেক্রেটারী, এ্যাডিশন্যাল প্রাইভেট সেক্রেটারী, এ্যাসিসট্যাণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী, তিনজন পি. এ, জনাকতক কেরাণী আর আধ ডজন বেয়ারা-চাপরাশীও একদিন চলে যাবে। যখন দোর গোড়ায় লাখ টাকার গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকবে না, তখন? হয়ত সম্বিত ফিরে পাবে সৌমেন। কিন্তু আমি? আমরা? মা, দাদা-দিদি, অশোক-মানু? গোরা, ছোট ভাই?

ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। খেয়াল করিনি মুখার্জীবাবু এসেছেন। হঠাৎ দেখতে পেলাম, কি ব্যাপার?

'টেলিফোনের বাজার বাজিয়ে জবাব না পেয়ে····

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ! মিসেস ভীমাপ্পা আসছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

‘এক্ষুণি ?’

‘হ্যাঁ, এক্ষুণি আসছেন।’

‘এলে ভিতরে পাঠিয়ে দেবেন।’

‘আচ্ছা।’

অনেক দিন পর অনুরাধা এলো। ওকে দেখে ভীষণ ভাল লাগল। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেই, নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না; তবু বুঝলাম খুশীতে আমার মুখখানা জ্বলজ্বল করছে। শীতের দিনে গরম জামা-কাপড় পরতে পরতে বিরক্ত লাগে। লেপ-কম্বল দেখলেই রাগ হয়। তারপর শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে প্রথম যেদিন সুতীর জামা-কাপড় পরা হয়, সেদিন নিজেকে ভীষণ হালকা লাগে। ভাল লাগে। অনুরাধাকে দেখেও আমার মনটা ঠিক তেমনি হালকা মনে হলো। ডাক দিলাম, এসো অনুরাধা।

অনুরাধা হাসি মুখে আমার দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ তোমরা সবাই ?

অনুরাধা সামনের একটা বেতের চেয়ারে বসতে বসতে বললো, ভাল, তবে সবাই খুব ব্যস্ত।

‘অনুসূয়া কবে আসছে ?’

‘পরশু।’

‘দাদুর সঙ্গে ?’

‘ওর কাকা-কাকিমাও একই সঙ্গে আসছে।’

‘দাদা কোথায় ? এখানেই ?’

‘না, ও একটা জরুরী কেসের জন্য কাল এলাহাবাদ গিয়েছে....

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। না গিয়ে পারল না।'

'কবে ফিরবেন ?'

'আজ রাত্রে টেলিফোন করে জানাবে কবে আসছে।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল ভিতরে যাই।

'উর্মিলা, আমি কিন্তু বেশীক্ষণ দেরী করব না। নেহাত ও নেই বলে আমাকেই কার্ডগুলো নিয়ে বেরুতে হয়েছে।'

আমি ডান হাত দিয়ে ওর গাল টিপে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আমাকে কার্ড দিতে এসেছ ?

'হ্যাঁ। তোমাদের কার্ডটা দিতেই এলাম।'

দু'এক মিনিট আমি কোন কথা বললাম না। মুখ নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনুরাধা আমার হাত দুটো ধরে জিজ্ঞাসা করল, কি হলো ? কথা বলছ না যে ?

ঠোঁটের কোণায় একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বললাম, লক্ষীটি, আমাকে কার্ড দিও না।

ও চমকে উঠল, কেন ? তুমি যাবে না ? এক নিঃশ্বাসেই জানতে চাইল, দাদা বারণ করেছেন ?

'তোমার মেয়ের বিয়েতে যেতে বারণ করার সাহস তোমার দাদার নেই········

অনুরাধা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি কিছু মনে করো না। হঠাৎ জিভ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে।

'কিছু মনে করিনি ভাই। তোমার মনে এমন ভয় হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক।'

'মোটেও স্বাভাবিক না। আমি সত্যি····

'অনুরাধা, তুমি মাইশোরের মেয়ে, আমি বাঙ্গালী। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই ঠিকই, কিন্তু আমি যে তোমাদের

ভালবাসি ভাই......

ও আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি যে আমাদের কত ভালবাস, সে কথা আর বলতে হবে না। এবার আমার হাতটা ধরে বললো, তোমাকে কার্ড দেব না। চল, এবার ভিতরে যাই।

ভিতরে এসে মাধো সিংকে কফি করতে বলে ফ্রিজ থেকে আমি কটা মিষ্টি এনে অনুরাধাকে দিলাম, নাও, খাও।

'এই এতগুলো?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, মেয়ের বিয়ের আনন্দে নিশ্চয়ই সকাল থেকে কিছু খাওনি। যা দিয়েছি, চুপ করে খেয়ে নাও।

'কিন্তু.......

'অনুরাধা! এবার কিন্তু বকুনি দেব।'

ও একবার মুখ তুলে আমার দিকে চাইল, হাসল। 'তোমার কাছে কি সবাইকে হেরে যেতে হবে?'

'সবাই হারে কিনা জানি না, তবে আমি আমার কাছে হেরে যাচ্ছি।'

অনুরাধা আমার মনের কথা জানে। জানে, ভালবেসে ব্যর্থ হবার এক দুঃখ, কিন্তু পেয়ে হারাবার দুঃখ অনেক, অশেষ। ও জানে আমি স্বামীর, কিন্তু স্বামী আমার নয়। আমার চাইতে ওর আই-সি-এস সেক্রেটারী অনেক কাছের মানুষ। তাছাড়া দুজনের মাঝখানে সেতু বন্ধনের জন্য একটা সন্তান পর্যন্ত হলো না। আমার মুখে হাসি আছে, দেহে যৌবনের দীপ্তি না থাকলেও মাদকতা আছে। কিন্তু মন? সে আরাবল্লীর মরু প্রান্তরের মত ধূসর, বিবর্ণ, রসহীন, প্রাণহীন।

ও আমাকে সান্ত্বনা জানিয়ে বললো, তুমি কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ধপাস করে ওর পাশে বসে পড়লাম। 'জানি অনুরাধা, মাঝে

মাঝে খুব সিরিয়াসলি চিন্তা করি ডিভোর্স করি। একজন সাধারণ ভদ্দর লোককে বিয়ে করি। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় না, না, তা হয় না। হতে পারে না·······

মাধো সিং দু'কাপ কফি দিয়ে গেল।

অনুরাধা একটু শাসন করার সুরে বললো, ঐসব আজে-বাজে কথা আমাকে বলবে না তো!

আমি হাসলাম, তোমাকে ছাড়া আর কাকে এসব কথা বলতে পারি অনুরাধা?

'কাউকে বলতেও হবে না, ভাবতেও হবে না।'

'ভয় নেই অনুরাধা, তোমার দাদাকে আমি সত্যি ভালবাসি। ওকে ছেড়ে যেতে আমি পারব না। ও ছাড়া অন্য কোন পুরুষ আমাকে উপভোগ করবে, ভাবতেই আমার ঘেন্না লাগে।'

'দাদাও তোমাকে খুব ভালবাসেন।'

'ভালবাসে ঠিকই কিন্তু......

অনুরাধা কিছুতেই আর এগুতে দিল না। 'থাক, আর ঐ কিন্তু নিয়ে ভাবতে হবে না।'

মিষ্টি আর কফি খেতে খেতে অনুরাধা জানাল, দাদাকে সিঙ্গাপুর আর কুয়ালালামপুর—দু' জায়গাতেই ও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে।

আমি অবাক হলাম, তাই নাকি?

'দাদাকে খবর দেব না?'

'কিন্তু ও তো সেদিন ব্যাংককে থাকবে।'

'অনুসূয়ার বিয়ের পর দিনই তো দাদার কলকাতা আসার প্রোগ্রাম·······

'পরের দিন সকালের বদলে আগের দিন বিকেলে রওনা হলেই দাদা অনুসূয়ার বিয়ে এ্যাটেণ্ড করতে পারবেন।'

আমি হাসলাম। 'তোমরা বুঝি প্লেনের টাইম টেবিল মিলিয়ে দেখেছ?'

অনুরাধাও হাসল। 'সত্যি বলছি, বিকেলে বি-ও-এ-সি-র একটা ফ্লাইট আছে। ঐ ফ্লাইট ধরে কলকাতা এলে সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর প্লেন পেয়ে যাবেন।'

কি আর বলব? শুধু হাসলাম।

অনুরাধা বললো, তুমি হাসছ?

'হাসব না?'

'আর যাই হোক অনুসূয়াকে দাদা খুব ভালবাসেন। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই আসবেন।'

'অনুসূয়াকে নিশ্চয়ই ভালবাসে। কিন্তু বোধহয় রাজনীতি, ক্ষমতা, যশ, প্রতিপত্তিকে আরো ভালবাসে।'

'তুমি দাদার উপর সত্যি ভীষণ রেগে আছ।'

'এটা রাগের কথা নয়, বাস্তব উপলব্ধির কথা।'

আরো কিছুক্ষণ কথা বলে অনুরাধা চলে গেল। অনেক লোকের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে কার্ড দিতে হবে। গাড়ীতে উঠতে যাবার আগে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কখন আসবে?

'ভয় নেই, আমি সারা দিনই তোমার ওখানে থাকব।'

ড্রাইভার আস্তে আস্তে গাড়ী চালাতে শুরু করল। জানলা দিয়ে হাসি মুখখানা বের করে অনুরাধা হাত নাড়তে নাড়তে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আমি তবু চলে যেতে পারলাম না, অনেকক্ষণ ঐখানেই পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনুরাধার কথা, অনুসূয়ার বিয়ের কথা ভাবতে ভাবতে সারা দুপুরটা বেশ কাটিয়ে দিলাম। বিকেল বেলায় আলি সাহেবের

ছেলে দেখা করতে এসেছিল। ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্কলারশিপ পেয়েছে। তিন বছরের জন্য বিলেত যাচ্ছে। ও থাকতে থাকতেই মিসেস বড়ুয়া এলেন ওর বাটিক প্রিন্টের একজিবিশন দেখার নেমন্তন্ন করতে। আস্তে আস্তে সব মানুষের আসা-যাওয়া বন্ধ। বাইরের অফিস ঘর বন্ধ করে মুখার্জীবাবু আর বাবুরামও চলে গেলেন। আমি হাতে একটা বই খুলে বসেছিলাম, পড়ার মত মন ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মাধো সিং দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। বুঝলাম ও ছুটি চায়, বউ-ছেলে মেয়ের কাছে যেতে চায়। ও কিছু বলার আগেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি মাধো সিং, খেয়ে নেব?

ও শুধু হাসল।

'খেতে দাও, আমি আসছি।'

আমার খাওয়া হলো। মাধো সিং ফিরে গেল ওর সংসারে। ঘরদোর পরিষ্কার করে, আলোবাতি নিবিয়ে চন্দনলাল চারদিকের দরজায় তালা লাগাতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের জন্য ও এখন পিছন দিকের কোয়ার্টারে যাবে। তারপর ও আর ওর স্ত্রী আসবে ওপাশের বারান্দায় শুতে। একটু পরেই পাহারাদাররা এসে যাবে। ভয় নেই, কিন্তু অস্বস্তি? অতৃপ্তি? নিঃসঙ্গতার বেদনা? ধূসর বিবর্ণ জীবনের রুক্ষতার জ্বালা থেকে কে আমাকে বাঁচাবে?

অনেক রাত অবধি ঘুম এলো না। জেগে রইলাম। পাশেই বেড-সাইড টেবিলে টেবিল লাইটের তলায় ঘড়ি আছে কিন্তু দেখলাম না। কি হবে ঘড়ি দেখে? ঘড়ি বলতে পারে কখন রাত্রির অন্ধকার ফুরোবে, কখন ভোরের আলো ফুটবে। কিন্তু আমার মনের অন্ধকারের অন্তিম মুহূর্ত তো কোন ঘড়ি বলতে পারবে না।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। বুঝলাম, এখনও আটটা বাজে নি, মুখার্জীবাবু আসেন নি। উনি এলে, উনিই টেলিফোন ধরতেন। দরকার হলে 'বাজার' বাজিয়ে আমাকে কথা বলতে বলতেন। গড়াতে গড়াতে বিছানার

ওপাশে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম, হ্যালো !

'কে ? উর্মিলা ?'

'হ্যাঁ। আপনি ?'

'আমি শেখর।'

'কবে এলে ?'

'তিন দিন হলো এসেছি। কালই চলে যাব।'

'তিন দিন এসেছ আর আজ টেলিফোন করছ ?'

'ভাবি তোমাকে টেলিফোন করব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না করে পারি না।'

আমি হাসলাম। 'ইন্দ্রানী বুঝি কাছে নেই ? তাই এইসব বলছ...

'আমি এবার ওর ওখানে উঠিনি। এবার হোটেলে উঠেছি।'

'সে কি ? আমরা থাকতে হোটেলে উঠলে কেন ?'

শেখর হাসতে হাসতে বললো, হাজার হোক তুমি আমার প্রিয় বান্ধবী। তারপর কাগজে দেখলাম সৌমেন সিঙ্গাপুরে গেছে। সুতরাং তোমার বেশী কাছাকাছি থাকা কি ঠিক ?

আমি ওকে ব্রেকফাষ্টের আমন্ত্রণ জানালাম, ন'টা নাগাদ এসো, একসঙ্গে ব্রেকফাষ্ট করা যাবে।

'আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি। ন'টার মধ্যে ইউ-পি-এস-সি-তে পৌঁছতে হবে...

এবার প্রস্তাব করলাম, বেশ তাহলে লাঞ্চে এসো।

'লাঞ্চের পর সিনেমা দেখাবে ?'

আমি একটু হাসলাম। বললাম, দেখাব।

শেখরের আসতে আসতে প্রায় দেড়টা হয়ে গেল। ও আসার সঙ্গে সঙ্গেই খেতে বসলাম। খেতে বসে বললাম, এবার তুমি অনেক দিন পর এলে।

'অনেক দিন না, তিন মাস পরে এলাম।'

'তাই কি? বোধহয় তার চাইতে বেশী।'

শেখর হাসল। 'না, ঠিক তিন মাস পরেই এলাম।'

খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় দুজনে একটু গল্প করছিলাম। মুখার্জীবাবু টেলিফোনে বললেন, ম্যাডাম, এবার রওনা হয়ে যান। তা নয়ত শো শুরু হয়ে যাবে।

আর দেরী করলাম না। রওনা হলাম। ডিলাইটে পৌঁছে দেখি ইণ্টারভ্যাল হয়েছে। আমরা আমাদের সীটে বসার পরই আলো নিভে গেল, ছবি শুরু হলো।

দেবানন্দ আর ওয়াহিদা রহমানের প্রেমের দৃশ্য দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো মাঝখানের হাতলে আমার হাতের উপর শেখরের হাত। মুখে কিছু বললাম না, হাতটাও টেনে নিলাম না। বোধহয় পারলাম না। আবার সিনেমা দেখতে বিভোর হয়ে গেলাম।

ছবি শেষ হলো। হল থেকে বেরুলাম। ভীষণ ভীড়। ইভনিং শোয়ের লোকজনও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে। এগিয়ে যাওয়াই দুষ্কর। শেখর এক হাত দিয়ে আলতো করে আমাকে জড়িয়ে ধরে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলো। আমি ওকে কিছু বলতে পারলাম না।

সাত

কলকাতা থেকে দাদার একটা এয়ার প্যাকেট এলো। খুলে দেখি অনুসূয়ার জন্য একটা সুন্দর শাড়ী আর রবীন্দ্রনাথের ক'খানা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ। আমি জানতাম না ওরা দাদাকেও নেমন্তন্ন করেছে। অনুসূয়ার বিয়েতে দাদার কর্তব্য ও ভালবাসার নজীর পেয়ে ভাল লাগল। প্যাকেটের ভিতরে দুটো চিঠি ছিল। অনুরাধার আর অনুসূয়ার। আমাকেও একটা ছোট্ট চিঠি দিয়েছিলেন এই শাড়ী আর বই পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানিয়ে। আমি দেরী করলাম না। সঙ্গে সঙ্গে দাদার উপহার অনুসূয়াকে দিয়ে এলাম।

অনুসূয়াকে দেখে বেশ লাগল। সুন্দর মুখখানা আরো বেশী সুন্দর, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একটু যেন চঞ্চল, একটু বেশী সপ্রতিভ। বিয়ের আগের দিন সব মেয়েই এমন হয়। আমিও হয়েছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভীমাপ্পা দাদা অত্যন্ত ব্যস্ত। আমাকে দেখেই ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, সৌমেনের কোন খবর পেয়েছ ঊর্মিলা?

'না, দাদা।'

'আজ নিশ্চয়ই একটা খবর আসবে।'

আমি জবাব দিলাম না, শুধু হাসলাম।

'হাসছ উর্মিলা? দেখো ও ঠিক আসবে। না এসে পারবে না।' ঠোঁটটা একটু কামড়ে দৃষ্টিটা আমার চোখের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, অনু কি শুধু আমাদের মেয়ে? তোমাদের মেয়ে না?

ভীমাপ্পা দাদা আর কোন কথা না বলে আমার কাছ থেকে যেন পালিয়ে গেলেন।

ওদের বাড়ীর সবাই সৌমেনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি একই জবাব দিলাম সবাইকে, না, কোন খবর নেই। গাড়ীতে ওঠার সময় অনুসূয়া ছুটে এসে বললো, উর্মি মা, আংকেলের খবর পেলেই আমাকে একটা টেলিফোন কোরো।

আমি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললাম, নিশ্চয়ই তোকে টেলিফোন করব।

আজ অনুসূয়ার বিয়ে। আমাদের অনু মা'র বিয়ে।

অন্য দিন অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠি। আজ ভোরবেলাতেই ঘুম ভেঙে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। বাথরুমে গেছি। স্নান করেছি। কাপড়-চোপড় পরে তৈরী হয়ে দেখি সাড়ে সাতটা বাজে।

মাধো সিং চা দিল। চা খেয়ে বারান্দায় একটু পায়চারি করতে করতেই মুখার্জীবাবু এলেন। আমি আর দেরী করলাম না। গাড়ীতে ওঠার আগে মুখার্জীবাবুকে বললাম, ব্যাংকক থেকে কোন খবর এলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।

'নিশ্চয়ই জানাব।'

'আপনি যখন খেতে যাবেন তখন কাউকে খেয়াল রাখতে বলবেন।'

'আচ্ছা।'

আমি বিয়ে বাড়ীতে চলে গেলাম।

ন'টা, দশটা, এগারটা বাজল। মুখার্জীবাবুর কোন টেলিফোন এলো না। আমিই তাকে টেলিফোন করলাম। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই উনি বললেন, না, ম্যাডাম, এখনও কোন খবর আসে নি।

'আপনি বরং জয়েন্ট সেক্রেটারীর কাছে একটু খবর নিন। হয়ত শুধু মিনিস্ট্রিতেই খবর আসবে।'

'এক্ষুণি খবর নিচ্ছি।'

'উনি কি বলেন আমাকে জানাবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

না, জয়েন্ট সেক্রেটারীও কোন খবর পান নি।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। বিয়ে বাড়ীর রঙীন আলোগুলো জ্বলে উঠল কিন্তু তখনও ব্যাংকক থেকে কোন খবর এলো না। বিকেল বেলা পর্যন্ত সবাই সৌমেনের খবর জিজ্ঞাসা করেছেন। এখন আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করছেন না।

অতিথি, বরযাত্রীরা এসে গেছেন। পাশের প্যাণ্ডেলে খাওয়া-দাওয়া শুরু হবে এক্ষুণি। কয়েকজন মিনিষ্টার এসে চলে গেলেন। অনেক এম-পি-র সঙ্গেই আমার দেখা হলো। ঘুরে-ফিরে অনুসূয়ার ঘরে গেলাম। সেজে-গুজে বসে আছে। ইসারা করে আমাকে ডাকল। মেয়েদের ভীড় ঠেলে ওর কাছে গেলে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, আংকেলের কোন খবর নেই ঊর্মি মা?

'না, মা। এখনও কোন খবর নেই।'

'কলকাতার প্লেন তো এই বেলা এসে গেছে?'

হাতের ঘড়ি দেখে বললাম, হ্যাঁ, এসে গেছে।

বিয়ে হয়ে গেল। অনুসূয়া আর জামাই ভীড়ের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি কি একটা জরুরী কাজে ভিতরে গেছি। হঠাৎ একটা চীৎকার শুনতে পেলাম, অনু মা!

ছুটে এসে দেখি সৌমেন দু'হাত দিয়ে অনুসূয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলছে, তোর ঐ হতভাগা বাপটাকে দূরে চলে যেতে বলতো মা!

ভীমাপ্পা দাদা আনন্দে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ঐ ভীড়ের মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কি ঊর্মিলা, বলি নি তোমার হতচ্ছাড়া স্বামী না এসে পারবে না?